পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা
মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সহপাঠ উপন্যাস গ্রন্থ হিসেবে নির্বাচিত ও অনুমোদিত।

[বোর্ডের পত্র সংখ্যা ১৯৩১ (৪) শিঃ সঃ ৭২/৯৭ তারিখ ৩/১১/১৯৯৮ ইং।

[পুনঃ অনুমোদন পত্র সংখ্যা ঃ ১৭৮৪ তারিখ ২২/০৯/২০০২ ইং]

[পুনঃ অনুমোদন পত্র সংখ্যা ঃ পাপু/সম্পাদনা ২১/০২/৫৬৫ তারিখ ২৬/০৪/২০০৫ ইং]

[বোর্ডের পত্র সংখ্যা ১৫৫২ তারিখ ০৭/১১/২০০৭ ইং]

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[কলেজ সংস্করণ]

ভূমিকা সংবলিত

সম্পাদনা

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

কামরুল এন্টারপ্রাইজ

পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা, আমদানিকারক ও সরবরাহকারী

৪২, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

কলেজ সংস্করণ, ভূমিকা সংবলিত

প্রকাশনায়

কামরুল হাসান

কামরুল এন্টারপ্রাইজ

৪২, বাংলাবাজার

ঢাকা- ১১০০

ডিজিটাল সংস্করণ

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

তত্ত্বাবধায়ক

বুলবুল আহমেদ

প্রথম কলেজ সংস্করণ	:	নভেম্বর ১৯৯৮
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	জুলাই ১৯৯৯
তৃতীয় সংস্করণ	:	ডিসেম্বর ২০০২
চতুর্থ সংস্করণ	:	জুলাই ২০০৫
পুনঃমুদ্রণ	:	নভেম্বর ২০০৭
পঞ্চম সংস্করণ	:	জুলাই ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ	:	এপ্রিল ২০১০
ডিজিটাল সংস্করণ	❑	জুন ২০১১
স্বত্ব	:	প্রকাশকের

প্রচ্ছদ : আসিফ হাসান

মুদ্রণে

এম. বি. প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন

৫৭, সুকলাল দাস লেন

ঢাকা- ১১০০

মূল্য: ৩৪.০০ (চৌত্রিশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মল্লিক ব্রাদার্স

৪২, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

৩/১, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

১৬০/১৬১, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা - ১২০৫

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নিবেদন

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যসূচি অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা আবশ্যিক বিষয়ের সহপাঠ হিসেবে নির্বাচিত ও অনুমোদিত হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সাহিত্য ধারার সাথে পরিচিত করা এবং তাদের ভাষাসম্পদ বৃদ্ধি, পাঠস্পৃহা বাড়ানো ও সাহিত্যের আঙ্গিকের সাথে তাদের পরিচয়দান ও সৃজনশীল লেখায় তাদের কুশলী করে তোলার লক্ষ্যে এ উপন্যাসটি পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অতি সুখ্যাত উপন্যাস। উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের নিবিড় জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উপন্যাসটিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়েছে। সে সাথে এতে উপন্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসটি অধ্যয়নে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এর ভূমিকাংশে বাংলা উপন্যাসের আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে যার দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা শুধু উপকৃত হবে তাই নয়, তারা উপন্যাস সম্পর্কে আরো বেশি আগ্রহী হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সম্পাদক জনাব কবিরউদ্দিন আহমদ মজুমদার পরিমার্জন করে উপন্যাসটিকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর উপযোগিতা দান করেছেন। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদক মিসেস কাজী কামরুন নাহার। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ বইয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্দেশিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভসহ সাহিত্যরস আস্বাদনে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

তারিখ

৩. ১১. ১৯৯৮ ইং

ঢাকা।

সম্পাদক

ভূমিকা

ক. উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠন কৌশল

'উপন্যাস' একটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের কাব্যে শব্দটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'উপন্যাস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'কল্পিত কাহিনী'। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় 'উপন্যাস' শব্দটি অনেকগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, উপন্যাস মাত্রই কল্পিত কাহিনী; কিন্তু কল্পিত কাহিনী মাত্রই উপন্যাস নয়। এ যুগে 'উপন্যাস' কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক, অনেক বিস্তৃত। সংস্কৃতে 'উপন্যাস' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম-উপ-নি-অস+অ (ঘঞ) = উপন্যাস। এ শব্দটির আর এক অর্থ উপস্থাপন। অর্থাৎ বিশেষ নীতি ও নিয়মের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় যে কাহিনী বিস্তৃত হয় তাই উপন্যাস। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা উপন্যাসের কাঠামো, নীতি, নিয়ম, কাহিনী বিস্তার প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে আধুনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্যের এক বিশেষ সাহিত্য-কৃতি Novel-এর অনুসরণ এবং এ যুগে 'উপন্যাস' শব্দটি ইংরেজি Novel-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি এ Novel-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এরকম : a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of a real life of the men and women portrayed. (Chamber's Twentieth Century Dictionary & Readers' Digest Encyclopedia). বিশিষ্ট ইংরেজি ঔপন্যাসিক E.M Forster বলেন: Novel is prose narrative of sufficient length to fill one or two volumes. এসব সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইংরেজি Novel বা বাংলা উপন্যাস হলো এক কল্পিত সুদীর্ঘ উপাখ্যান, গদ্যে লিপিবদ্ধ ও পাঠকের মনোরঞ্জনকারী সাহিত্য কর্মবিশেষ। E. M. Forster উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের পর এ কথাও বলেছেন যে, উপন্যাসের শব্দসংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত (Aspects of Novel)।

কতিপয় বাঙালি লেখকও উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য-সমালোচক শ্রী নারায়ণ চৌধুরী উপন্যাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ: 'উপন্যাস একটা জীবনের অখণ্ড রূপায়ন এবং সমগ্রতাই

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তার মর্মবস্তু। ..... একটা অর্থপূর্ণ অতীতের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে যে জীবন দূর ভবিষ্যতে বিসর্জিত আর বর্তমান তার সাম্প্রতিক স্থিতিকাল।" এখানে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, সে জীবন কেমন হবে? সে সম্পর্কেও সমালোচকের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: A novel is not life as it is but life as it should have been. উপন্যাসের জীবন অবিকল জীবন নয়, কিন্তু জীবন যে রকম হওয়া উচিত সে রকমই। জীবন ও জগতের অনেক প্রচ্ছন্ন সত্য বা অনুপস্থিত সত্য এবং জীবনের নানা অসঙ্গতিও উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

উপন্যাস কল্পিত কাহিনী ঠিকই কিন্তু তা কল্পনার অবাধ পক্ষ বিস্তারকে সমর্থন করে না। মানুষের মন ও জীবন নিয়েই উপন্যাসের কারবার বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সেখানে থাকতে হবে গভীর উপলব্ধি। জীবন ও জগতের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যেই রয়েছে উপন্যাসের মূল রহস্য। সে জন্য আধুনিক জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে এ যুগে Novel বা উপন্যাস কল্পনা করা যায় না।

জীবন ও জগতের অবিচ্ছেদ্য মানবিক বন্ধনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তার ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক যে কল্পিত উপাখ্যানের শৈল্পিক বিকাশ ঘটান, তার আকৃতি ও প্রকৃতি বেশ বিচিত্র। মানব জীবনের এ বিচিত্র বর্ণিল রূপই উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু এ বৈচিত্র্যময় জীবনকে যথাযথ রূপ দেয়া সহজ কাজ নয়। সমালোচক এ বিষয়েই ইঙ্গিত করে বলেছেন: No doubt each great man creates his own form but no novelist has yet created one. উপন্যাসের আখ্যানভাগ, চরিত্রচিত্রণ, পাত্র-পাত্রীদের মুখে দেশকালপাত্র-নির্ভর ভাষার প্রয়োগ, পটভূমি ও পরিবেশ পরিকল্পনা, বাণীভঙ্গি, রচনাশৈলী ও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন এবং জীবনবোধও যে উপন্যাস বিচারে একান্ত অপরিহার্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট বাঙালি লেখক হরপ্রসাদ মিত্র যথার্থই বলেছেন: "উপন্যাসের কলাকৌশলের আলোচনা প্রধানত তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি সংহত করার পরামর্শ দেয়। প্রথমত আখ্যান বা প্লটের কথা; দ্বিতীয়ত আখ্যানবস্তুর দেশকালগত অবস্থান এবং পরিবর্তন, অর্থাৎ ইংরেজিতে তাকে বলা হয় setting-এর এলাকা; তৃতীয়ত চরিত্র গঠন ও পরিবর্তন, পরিণতি ও পরিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ।"

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠন কৌশলকে সামনে রেখে উপন্যাসতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও সমালোচকরা উপন্যাসের পাঁচটি সূত্র বিবৃত করেছেন। যেমন-

১) প্রস্তাবনা;

২) সমস্যার উপস্থাপনা;

৩) আখ্যানভাগের মধ্যে জটিলতার প্রবেশ;

৪) চরম সংকট মুহূর্ত;

৫) সংকট বিমোচন বা উপসংহার।

গঠন রীতির বিভিন্ন শর্তাবলির কথা মনে রেখেও সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে যে, উপন্যাসকে অবশ্যই উপভোগ্য হতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যিক ও সমালোচক William Somerset Maugham যথার্থই বলেছেন, Finally a novel should be entertaining -it is an essential quality, without which no other quality is of any use. সমারসেট মম এখানে সঠিক কথাটিই বলেছেন। বাস্তবিকই উপন্যাস হবে উপভোগ্য, আনন্দসঞ্চারী ও আনন্দদানকারী। উপন্যাস মূলত আনন্দের সামগ্রী, আনন্দের সাথী। অবশ্যই তা মানসিক আনন্দ। আর যেকোনো মহৎ উপন্যাসই পাঠকের হৃদয়মনকে এক মহৎ আনন্দে আপ্লুত করে; জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক মহৎ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ করে তোলে।

উপন্যাস বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তা কখনো হয় কাহিনীনির্ভর, কখনো হয় চরিত্রনির্ভর, কখনো হয় মনস্তাত্ত্বিক, কখনো হয় নীতিকথামূলক, আবার কখনো হয় বক্তব্যধর্মী। তবে যে রকমই হোক না কেন, সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠনশৈলীকে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করতেই হবে।

বিষয়বস্তু ও প্রবণতা অনুসারে উপন্যাসকে অন্ততঃপক্ষে নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) ঐতিহাসিক উপন্যাস;

(২) সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস;

(৩) কাব্যধর্মী উপন্যাস;

(৪) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস;

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

(৫) ব্যঙ্গরসাত্মক উপন্যাস;

(৬) গোয়েন্দা উপন্যাস;

(৭) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস;

(৮) আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাস;

(৯) আঞ্চলিক উপন্যাস।

কোনো কোনো সমালোচক উপন্যাসের সাথে নাটকের মিল দেখেন। নাটকে যেমন- আখ্যান, চরিত্র, দৃশ্য, সংলাপ ইত্যাদি থাকে, উপন্যাসেও তেমনি এসব রয়েছে। সে কারণে বলা যায়, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মানব জীবনকে নাটকের মতো করে উপস্থাপন করে থাকেন। সে জন্য উপন্যাসকে পকেট থিয়েটার বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

লেখক কখনো কখনো নিজের ভাষায় পরের উক্তিতে উপন্যাসের কাহিনী উপস্থাপন করেন, আবার কখনো বা নিজের ভাষায় নিজের কাহিনীও উপন্যাসের মতো করে উপস্থাপন করেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই শর্ত একটাই যে, বর্ণনা ও উপস্থাপন হবে উপভোগ্য।

এখন উপন্যাসের নয়টি শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

(১) ঐতিহাসিক উপন্যাস : ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে উপন্যাস রচিত হয়, তা-ই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা থেকে যায়। তা হচ্ছে, ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে সেই যুগ ও সেই কালের প্রেক্ষাপটকে যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে তা সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হবে না। এ জন্যই বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ Dr. Johnson বলেছিলেন- যারা ইতিহাস জানতে চান, তাঁরা যেন স্কটের 'আইভানহো' উপন্যাস না পড়েন। উল্লেখ্য যে, আইভানহো একটি বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাস অথচ তাতে ইতিহাসের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তাই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের শর্ত হলো তা মূল ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। সেখানে মিথ্যার বেসাতি থাকবে না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের মূল কাহিনীকে অনুসরণ করবে। জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাস, অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সংস্কার ও রীতি-নীতিকে বিশ্বস্তভাবে অঙ্কন করতে হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। বলা চলে ইতিহাসের কঙ্কালকে ঔপন্যাসিক মানবীয় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনসত্তায় রূপান্তরিত করেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে লেখকের কল্পনা সংযোজিত হয়ে উপন্যাসটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মনে হবে যেন, সেই যুগ আর সেই সময়কালটা যেন পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এখানেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা। স্যার ওয়াল্টার স্কটের লেখা বিখ্যাত ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আইভানহো'র প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বিশ্বখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ভাসিলি ইয়ানের 'চেঙ্গিস খান' একটি বিখ্যাত সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। লিও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'-এর কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (অঙ্গুরীয় বিনিময়), রমেশচন্দ্র দত্ত (মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রাজসিংহ, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি) প্রমুখ সাহিত্যিকরাও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতকের শেষ পাদে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' লেখেন। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(২) **সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসঃ** পরিবার ও সমাজ জীবনের নানা বিষয়বস্তু, ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। এতে মানবজীবনের সাথে একান্তভাবে জড়িত আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জীবনঘনিষ্ঠ উপস্থাপনা থাকে। তা ছাড়া পারিবারিক নানা বিষয়, যেমন- সহায়-সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা, আর্থিক টানাপোড়েন, সাংসারিক সুখ-দুঃখ, স্নেহপ্রীতিপ্রেম ইত্যাদি অবলম্বন করে পারিবারিক উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের উপন্যাসের অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। যেমন, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও বিষবৃক্ষ', বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের লেখা 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি' প্রভৃতি উপন্যাস

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পারিবারিক উপন্যাসের বিশিষ্ট উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাস পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে, 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ', 'দেনা পাওনা', 'চরিত্রহীন', 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া', ইত্যাদি। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' সামাজিক উপন্যাসের একটি সার্থক উদাহরণ।

(৩) **কাব্যধর্মী উপন্যাস :** যেসব উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা লেখকের কাব্যদৃষ্টি প্রাধান্য পায় এবং বর্ণনা ও ভাষারীতিতে তা ফুটে ওঠে, সে ধরনের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' ও কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান', বুদ্ধদেব বসুর যে দিন ফুটল কমল', 'সাড়া', 'তিথিডোর' ইত্যাদি কাব্যধর্মী উপন্যাসের বিশিষ্ট উদাহরণ।

(৪) **মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস :** যে উপন্যাসের উপাখ্যানে পাত্র-পাত্রীদের মনোবিশ্লেষণ লেখকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে সে ধরনের উপন্যাসকে মনস্ত াত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের উপন্যাসে কাহিনী হয় অবলম্বন মাত্র, কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে মানবমনের জটিল দিকগুলোর সার্থক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) **ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস :** সামাজিক মানুষের নানা অসঙ্গতিকে তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের মাধ্যমে যে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয় তাকে ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস বলে। বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী ও সৈয়দ মুজতবা আলী এ ধরনের রচনায় বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন।

(৫) **গোয়েন্দা উপন্যাস :** বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাকে অবলম্বন করে সার্থক গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। এর কাহিনী হয় খুবই জটিল এবং লোমহর্ষক। লেখক অদ্ভুত লিপিকুশলতায় পাঠকমনকে সব সময় উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে পাঠককে আনন্দ দিতে দিতে নানা রহস্যের সন্ধান দিয়ে কাহিনী শেষ করেন। বলা হয়ে থাকে

যে, এ ধরনের উপন্যাস পাঠে পাঠকের কূটবুদ্ধির প্রসার ঘটে। গোয়েন্দা উপন্যাসের পাঠকেরা প্রধানত তরুণ-তরুণীই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গোয়েন্দা উপন্যাস রচয়িতা।

(৭) **আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস :** বিশ্বসাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটি বিশাল ধারা রয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও তা যথেষ্ট পরিপুষ্ট। ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে অদ্ভুত রচনাশৈলী ও লিপিকুশলতার মধ্য দিয়ে উপভোগ্য উপন্যাসে রূপদান করেন। এ ধরনের উপন্যাসকে বলা হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার খণ্ডে লেখা 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-কে অনেকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে অভিহিত করে থাকেন।

(৮) **আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাস :** কোনো ভূপর্যটক, ভ্যাগাবন্ড বা ভবঘুরে লেখক তাঁর ভ্রমণ-পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আত্মজীবনীর আদলে যখন উপন্যাসের মত সরস ও উপভোগ্য করে লেখেন, তখন তাই হয় আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' আত্মজীবনীমূলক ভ্রমণোপন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', প্রবোধ কুমার সান্ন্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন' গ্রন্থগুলোও উল্লেখযোগ্য।

(৯) **আঞ্চলিক উপন্যাস :** বিশেষ কোনো অঞ্চল ও সে অঞ্চলের নির্দিষ্ট এলাকা ও পরিসরের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিশ্রিত যে কাহিনী বা উপন্যাস তা-ই আঞ্চলিক উপন্যাস বলে পরিচিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' ও 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ. বাংলা উপন্যাস ও বাংলাদেশের উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা উপন্যাস

গল্প বলা বা গল্প শোনা বা নিজের মনের কথা অপরকে জানানোর আকুতি মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর অন্যতম। তাই দেখা যায়, যে যুগে মানুষ একান্তভাবেই ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতো, অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মধ্যেও অন্যকে মনের কথা জানানোর আকুতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে আবিষ্কৃত সে যুগের গুহা-মানুষদের নিজেদের হাতে আঁকা নানা ধরনের চিত্রাবলি সে সব মনোভঙ্গিরই প্রকাশ। তার পর পর্যায়ক্রমে মানবকূলে এসেছে নানা পরিবর্তন। মৌলিক বা লৈখিক ভাষার মাধ্যমে মানুষ যখন তার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে- তখনই উপাখ্যান বা কাহিনী প্রকাশের একটা ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই বলা যায় যে, গল্প বা কাহিনী বলা ও শোনা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি।

কাহিনী বলা ও শোনার প্রবৃত্তি যেমন মানুষের চিরন্তন, তেমনি তাকে লিপিবদ্ধ করে যুগপরম্পরায় মানবমনে সঞ্চারিত করার প্রকৃত্তিও তার চিরকালীন। এভাবেই রচিত হয়েছে নানা পৌরাণিক উপাখ্যান। পৃথিবীর আদি ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও রয়েছে নানা ঘটনাক্রম, নানা বৃত্তান্ত বা উপাখ্যান। ইউরোপীয় পুরাণগুলোতেও যেমন বর্ণিত হয়েছে নানা উপাখ্যান, এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন গ্রন্থাবলিতেও রয়েছে নানা উপাখ্যান বা বৃত্তান্ত। আরব জগতে 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা Arabian Nights যেমন সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনীমালার এক মহত্তম উদাহরণ, তেমনি ভারতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলোও অনুপম আকর্ষণীয় উপাখ্যান। এ ছাড়া ইরান ও পারস্যেও রয়েছে নানা উপকাহিনীর মালা। 'আলিফ লায়লা' ও পারস্যের উপন্যাসগুলো অনেকটাই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এজন্য ঐ কাহিনীগুলোকে কেউ কেউ আরব্য উপন্যাস ও পারস্য উপন্যাস বলে অভিহিত করে থাকেন। তাছাড়া পৌরাণিক কাহিনীগুলোও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তবে তা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত নয়। তবে তা যে কল্পিত কাহিনী এবং মহাকবি কালিদাসের কথায় (কল্পিত কাহিনী অর্থে) তা যে

উপন্যাস তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইংরেজি Novel অর্থে, উপন্যাস বলতে যা বোঝায় এ কিন্তু তা নয়। ইংরেজি Novel অর্থে উপন্যাস হতে হলে রচনাকে যথার্থভাবে আধুনিক রূপরীতিসম্পন্ন ও জীবনধর্মী হয়ে উঠতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের একটা ধারা বহমান ছিল। সেগুলোও ছিল কাহিনী। কাব্যে লেখা কাহিনী। যেমন- মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' ও কাহিনীকাব্য। এগুলোও কল্পিত কাহিনী কিন্তু ইংরেজি Novel অর্থে উপন্যাসের সংজ্ঞায় এগুলো পড়ে না।

ইংরেজি Novel অর্থে বাংলায় যে উপন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হয় তার মূল কিন্তু ইউরোপে। বরং কথাটা এভাবেই বলা যেতে পারে যে, আধুনিক উপন্যাসের জন্ম ইউরোপে এবং আধুনিককালে যে উপন্যাসের চর্চা বা উপন্যাস লেখা হয় তা পাশ্চাত্যেরই অবদান।

ইংরেজি Novel বা উপন্যাস লেখার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগে। সে যুগেই ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল এবং বর্তমান আধুনিক বিশ্বের অনেক অবদানেরই সূচনা হয়েছিল সেই যুগে। শুধু শিল্প বিপ্লব নয়; চিন্তাক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বহু সৃষ্টিই সে যুগের অক্ষয় অবদান। সে যুগের ইউরোপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু মনীষীর নাম করা যায়- যাঁরা ছিলেন সেই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এক্ষেত্রে আমরা শুধু সে যুগের ইউরোপের দু' একজন কবি-সাহিত্যিকের নাম করব যাঁরা নিজেদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সাধনার বলে ইউরোপীয় সাহিত্যকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার- এর 'ক্যান্টারবেরি টেলস' ও ইতালির কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' হলো কাব্যে লেখা কাহিনী, উপন্যাস নয়। ইংরেজ লেখক জোনাথন সুইফটের 'গ্যালিভারস ট্রাভেলস' ও ড্যানিয়েল ডি. ফোর- এর 'রবিনসন ক্রুশো' গদ্যে লেখা কাল্পনিক কাহিনী। বলা যায়–ইংরেজি ভাষায় এগুলোই ছিল সচেতনভাবে উপন্যাস লেখার প্রয়াস। এগুলোর কাহিনী খুবই উপভোগ্য। তবে এগুলো পুরোপুরি উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, হয়েছে উপন্যাসের কাছাকাছি বা 'উপন্যাসকল্প'। তা সত্ত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব উপন্যাসকল্প

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৃষ্টিই পরবর্তী ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তার পর নিত্য নতুন Novel বা উপন্যাস সৃষ্টিতে পাশ্চাত্যকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যারা সর্বাধিক পরিচিত ও বিশ্ববিখ্যাত এদের কয়েক জনের নাম যথাক্রমে টমাস হার্ডি, জর্জ ইলিয়ট, জেমস জয়েস, উইলিয়াম সমারসেট মম, চার্লস ডিকেন্স, লরেন্স উইলিয়াম গোল্ডিং প্রমুখ, রুশ সাহিত্যের মহান সাহিত্যিক লিওটলস্টয়, ফিওদোর দস্তয়েভস্কি, চেকভ, ম্যাক্সিম গোর্কি, বরিস পাস্টারনাক, আলেকজাণ্ডার সালঝেনেৎসিন, ভাসিলি ইয়ান প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সকল দেশেই সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল পদ্য, কিন্তু আধুনিক যুগে সাহিত্যের প্রধান বাহন গদ্য। এমন কী এ যুগে কবিতাও গদ্যের ঢঙে লেখা হয়ে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের মহৎ মানবজীবন-চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে পদ্যে, অর্থাৎ যে যুগে মহাকাব্য রচিত হয়েছে পদ্যে। কিন্তু এ যুগের মানুষের জীবনের মহাকাব্য রচিত হচ্ছে গদ্যে–অর্থাৎ উপন্যাসে। মহাকাব্যিক বিশালতায় পরিব্যাপ্ত এ যুগের একটি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'। এ গ্রন্থকে সমালোচকরা উপন্যাস রূপী মহাকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। এ মহৎ উপন্যাসের অমর স্রষ্টা হলেন লিও টলস্টয়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসকে অনেক সমালোচক মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করে থাকেন। তা ছাড়া বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একজন বর্ষীয়ান লেখক অন্নদাশংকর রায়ের 'সত্যাসত্য' (চার খণ্ডে)- কে অনেকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বিশাল উপন্যাস বলে অভিহিত করেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস মূলত পাশ্চাত্যের বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যেরই সংস্পর্শজাত বাঙালির সৃজনশীল মননের অবদান। অর্থাৎ কথাটা এভাবে বলা যেতে পারে যে, বাংলা উপন্যাস গড়ে উঠেছে দেশীয় পরিবেশে কিন্তু প্রেরণা ও রস সংগ্রহ করেছে ইউরোপের সাহিত্য থেকে।

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে দিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত

হয় সে দিন থেকেই এ ভূখণ্ডের মানুষ আধুনিক ইউরোপ তথা ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। বাঙালির সাহিত্য বা মননে সে দিন থেকেই একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা অত্যাধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে সেই আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন।

বাংলা ভাষার গদ্যে লেখা সর্বপ্রথম যে মুদ্রিত উপন্যাসের নাম জানা যায় তার নাম 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'। এর রচয়িত্রী একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টান মহিলা, নাম হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্স। প্রকৃতপক্ষে এ রচনাকে উপাখ্যানই বলা যেতে পারে, উপন্যাস নয়। তার পর ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'-এ 'বাবু' নামে একখানি আলোচনামূলক আখ্যান আত্মপ্রকাশ করে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'নব বাবুবিলাস' নামে আরো একখানি দীর্ঘ আখ্যায়িকা আত্মপ্রকাশ করে। এরপর, টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র লেখেন 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে উপন্যাস। তবে আধুনিক অলঙ্কার শাস্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ী এগুলোকে সার্থক উপন্যাস বলা যাবে না। বরং বলা উচিত উপন্যাসের কাছাকাছি অর্থাৎ উপন্যাসকল্প রচনা।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার গৌরব লাভ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমের পর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার ধারা অব্যাহত থাকে এবং বহু সৃজনশীল ঔপন্যাসিকের অবদানে তা ক্রমশ পুষ্ট হয়।

উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে ইতিহাসের আখ্যানবস্তু প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে সমকালীন জীবন চিত্র রূপায়ণের প্রতিবেশি মনোযোগী ছিলেন না। সুদূরস্থিত অতীতে কাহিনী গ্রন্থনায় অতীতের কাহিনী গ্রন্থনায় তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত, কল্পনার অবাধ পক্ষ বিস্তারের সুযোগটা সেখানে বেশি বলেই তিনি মনে করতেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটেও অবশ্য উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

কালের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বাংলা সাহিত্যের আর এক মহান ঔপন্যাসিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' একটি কালজয়ী সৃষ্টি।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

এর পরই বাংলা সাহিত্যে আর যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিমান ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভাধর। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর আর যে শাখাটিতে তিনি তাঁর প্রতিভারূপ পরশ পাথরের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তা হলো উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপন। বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, যোগাযোগ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। মানবমনের চিরন্তন চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব নিপুণ বিশ্লেষণে সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের রূপ পরিগ্রহ করেছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এখানে গভীরতম উপলব্ধির মহৎ প্রকাশ ঘটেছে।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস পড়লে পাঠক মনে একটা প্রতীতি জন্মায় যে, তাঁর রচনায় কাহিনীর আকর্ষণ আছে কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ তেমন একটা নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটা খুবই সার্থক অভিধা। তিনি তৎকালীন জমিদারী শাসিত সমাজের সামাজিক জীবনচিত্র আশ্চর্য দক্ষতার সাথে তাঁর সাহিত্যে রূপদান করেছেন। এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনচিত্র যেমন বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি পরাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনচিত্রও সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর নাম যথাক্রমে বড়দিদি, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত (চার খণ্ডে), দেবদাস, বিপ্রদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবি ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের হাতে উপন্যাস সৃষ্টির এক আশ্চর্য জাদু ছিল। গল্পের গভীর আকর্ষণ ও আকর্ষণীয় কাহিনীভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্টতার মর্যাদা দিয়েছে।

মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে সে যুগে যাঁরা বিশিষ্টের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

বাংলা উপন্যাসের পরবর্তী ধারাও বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যিক অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, কাজী আবদুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র, অবধূত, সমরেশ বসু প্রমুখ।

এছাড়াও বর্তমান যুগে পশ্চিমবাংলার আরো কয়েকজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের নাম করা যায় যাঁরা উভয় বঙ্গে খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয়। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, আবুল বাশার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ।

বাংলাদেশের উপন্যাস

১৯৪৭ সালে ভারত ও বাংলা বিভাগের পরে পাকিস্তানের অংশরূপে বাংলার যে এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত হয় তা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা এ পূর্ব পাকিস্তানেই প্রবাহিত হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে পুনরায় বিভক্তির পরে যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়, সে ধারা বর্তমান বাংলাদেশে একটি সার্থক পরিপুষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সে হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যে উপন্যাসগুলো লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তা-ই বাংলাদেশের উপন্যাসরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নবীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়স প্রায় ৩১ বছর ছয় মাস। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সাহিত্যের মোট অগ্রগতির তুলনায় উপন্যাস সাহিত্যের পরিমাণ যথেষ্ট কম। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাহিত্য যথেষ্ট বৈচিত্র্যের দাবিদার। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাস বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বাংলাদেশের উপন্যাসে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জীবন থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রের কথা রূপায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা বাংলাদেশের জনগণের উপযোগী উপন্যাস সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রয়াত সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদের নাম করা যেতে পারে। আবুল মনসুর আহমদ তার সমকালে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে বাংলাদেশের জনজীবনের সার্থক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর 'সত্যমিথ্যা', 'আবেহায়াত', 'জীবনক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজল গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি ছাড়াও কিছু উপন্যাস রচনা করেন। সেগুলো যথাক্রমে 'চৌচির', 'জীবন পথের যাত্রী', 'সাহসিকা', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' ও 'রাঙ্গা প্রভাত'। এ উপন্যাসগুলোতে বাংলাদেশের জীবনচিত্রের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। মাহবুব-উল-আলম, স্মৃতিকথা, ইতিহাস ও গল্প রচনা করলেও একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকও। 'মোমেনের জবানবন্দি' নামক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর অন্য একটি উপন্যাসের নাম 'মফিজন'। শওকত ওসমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তাঁর যে উপন্যাসগুলো তাঁর খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–বড়ী, বনী আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ও সমাগম উপন্যাসিক শওকত ওসমান তাঁর এ উপন্যাস গুলোতে নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ করেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর স্বল্প পরিসরের জীবনে বিশিষ্ট কথাশিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর 'লালসালু' একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। তাছাড়া তাঁর 'কাঁদো নদী কাঁদো' ও 'চাঁদের অমাবস্যা' বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে পড়ে। আবু ইসহাক বাংলাদেশের একজন প্রবীণ ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের

নাম 'সূর্যদীঘল বাড়ি'। আলাউদ্দীন আল-আজাদ উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়াও তাঁর কয়েকটি উপন্যাস তাঁকে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী', 'ক্ষুধা ও আশা' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এক সময়কার জনপ্রিয় কথাশিল্পী আকবর হোসেন 'কী পাইনি', 'অবাঞ্ছিত', 'মোহমুক্তি' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান হন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম কয়েকটি উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান হন। 'কাশবনের কন্যা' ও 'দুই মহল' তাঁর বিশিষ্ট সৃষ্টি। কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ 'চর ভাঙ্গা চর' উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান হন। ঔপন্যাসিক হিসেবে সরদার জয়েনউদ্দীনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। 'পান্নামোতি', 'নীল রঙ রক্ত', 'অনেক সূর্যের আশা' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সহিত্যিক আবদুর রাজ্জাক 'কন্যাকুমারী' নামক উপন্যাস লিখে পুরস্কৃত হন। শহীদুল্লাহ
আবদুর রাজ্জাক 'কন্যাকুমারী' নামক উপন্যাস লিখে পুরস্কৃত হন। শহীদুল্লাহ
কায়সারের 'সারেং-বউ' একটি বিখ্যাত উপন্যাস। রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' ও 'আরেক ফাল্গুন' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি ও ছোটগল্পকার পরিচয়ের বাইরে সৈয়দ শামসুল হকের রয়েছে ঔপন্যাসিক পরিচয়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের নাম হচ্ছে : সীমানা ছাড়িয়ে, রক্ত গোলাপ, দেয়ালের দেশ, এক মহিলার ছবি ইত্যাদি। এছাড়া বন্দে আলী মিয়া, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মবিনউদ্দীন আহমদ, কাজী আবুল হোসেন, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবু রুশদ, আশরাফুজ্জামান, ইসহাক চাখারী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাহাত খান, হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, মইনুল হোসেন সাবের প্রমুখ বিখ্যাত। সাম্প্রতিক কালের হুমায়ুন আহমেদের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নুরুন্নাহার, রাজিয়া খান, রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেন, নীলমা ইব্রাহীম ও দিলারা হাশেমের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টির ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নবীন-প্রবীণ লেখকেরা নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ. নির্বাচিত উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের পরিচিতি

নির্বাচিত উপন্যাস : পদ্মানদীর মাঝি

লেখক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুরসহ পার্শ্ববর্তী দু'একটি গ্রাম ও পদ্মানদীর পটভূমিকায় লেখা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এ বিখ্যাত উপন্যাসটির রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে বি.এস.সি অধ্যয়নকালে 'অতসী মামী' নামে একটি গল্প রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেন। পড়াশুনা তিনি শেষ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে সাহিত্য-সৃষ্টিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর এ গৌরবজনক পদচারণা তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৬) পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'জননী'। এটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তার পর পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় অন্যান্য উপন্যাস। যথা-দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরতলী, চতুষ্কোণ, জীবন্ত, সোনার চেয়ে দামী, ইতিকথার পরের কথা প্রভৃতি। এছাড়া লেখেন 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'আজ কাল পরশুর গল্প', ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্যিক- অর্থাৎ তিনি ছিলেন বস্তুবাদী লেখক। তাঁর রচনার সর্বত্রই তাঁর এ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনাবলির মধ্যেই তাঁর জীবনাদর্শনের সার্বিক রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও মতবাদ নয়, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদের জয়ই সেখানে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধাত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা ভাঙাগড়ার

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে যাঁদের সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তিনি সেই যুগ ও সেই কালের প্রতিনিধি একজন দায়িত্বশীল সাহিত্যিক প্রতিনিধ এবং শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী কথাশিল্পী। তাঁর সম্পর্কে জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন- "তিনি এ অর্থে বাংলা সাহিত্যের সার্থক রিয়ালিস্ট শিল্পী যে সমসাময়িক কালের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের ট্র্যাজেডি এত নির্মম, সত্যনিষ্ঠ ও শিল্প কুশলতার সঙ্গে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা সমাজের ক্ষয়ক্ষতি, মনুষ্যত্বের অপচয়, হতাশা ও গভীর বিষাদ তাঁর লেখনীতে মর্মান্তিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বামপন্থী হলেও তিনি ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী কথাশিল্পী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমানস সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ যথার্থই লিখেছেন- "সাম্প্রতিক কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের সাংকেতিক রহস্য আরোপ করেছেন তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে। নাটকীয়তাকে পরিহার করে বক্র বাচনের ঔজ্জ্বল্যে স্বল্পকথায় এবং বহুল ইঙ্গিতে বুদ্ধির সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায় তিনি একক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। যৌন ক্ষুধার বিকৃতিও যে শিল্পকর্মে স্থান লাভের উপযোগী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা তার স্বাক্ষর।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের শিল্পকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন- "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যধিক রিয়াজিলম ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্প ও জীবন সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই বিচ্যুত করেছে। এমন কী মধ্য ও শেষের দিকের লেখায় তিনি সচেতনভাবে অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অন্যায় হয় না" (নারায়ণ চৌধুরী, সমকালীন সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বগুলো স্মরণে রাখলে তাঁর সাহিত্য জানতে ও বুঝতে সহজ হবে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

উপন্যাস পরিচিতি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯টি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক বিদেশি ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম 'পদ্মানদীর মাঝি'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার পরে ভারতীয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হওয়ার গৌরব লাভ করে এ উপন্যাসটি। ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষাসহ ইংরেজি, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রুশ, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ ভাষায় এ উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) মানিকের চতুর্থ উপন্যাস। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'Boatman of the Padma' প্রকাশিত হয়।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পদ্মার মাঝি ও জেলেদের বিশ্বস্ত জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। শহর থেকে দূরে দীন-দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের যে জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে তা যেন বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া এক বিশ্বস্ত জীবনচিত্র। জেলেপাড়ার মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-অভাব-অভিযোগ-যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা এখানে বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। অলঙ্কার শাস্ত্রের আঞ্চলিক উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সে অনুসারে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। উপন্যাসের আঙ্গিক গঠন, রচনাশৈলী, পাত্র-পাত্রীদের মুখে আরোপিত ভাষা, জীবনাচরণ, জীবনচর্চা এ সবই আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিচয়বাহী। এ সকল কারণে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবিদার এবং এ উপন্যাসের জগৎ বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ এক অজানা বস্তু বলে মনে হয়। নানা কারণে উপন্যাসটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করে। এ উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন- "ইহার একটি কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব- পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবনযাত্রারও আকর্ষণীয় শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতাবিবর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটি সর্বশেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ইহা সম্পূর্ণরূপে

নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সাতন মানব-প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা-নির্দেশ।"

জেলে অধ্যুষিত গ্রামের জীবনযাত্রাই আলোচ্য উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। এখানকার সমস্ত কিছুই যেন পরিচালিত হয় প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে। এ আঞ্চলিক উপন্যাসটির সার্থকতা বিষয়ে সমালোচকের এ উক্তিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ উপন্যাসটির কোথাও "এই ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত নাই।" এ উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন- "অধিবাসীদের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি, সমবেদনা, চক্রান্ত, দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যস্থতা ছাড়া নিজ প্রকৃতি নির্ধারণ সঙ্কীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে।"

একটি সুখপাঠ্য, সার্থক ও বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে এখানেই এর সার্থকতা।

ঘ. উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ, সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা।

ঘ. ১. কুবের

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। কুবের এ উপন্যাসের নায়কও। সংসারের অভাব-দারিদ্র ও দুঃখ-বেদনাদগ্ধ কুবের একদিকে যেমন তার সংসারের অভিভাবক, তেমনি সে চিরপঙ্গু মালার স্বামী, অন্য দিকে সে তার সন্তানদের স্নেহময় পিতা। শহর থেকে দূরে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত অজগ্রাম কেতুপুরের সে বাসিন্দা। পদ্মানদীর সে এক পাকা মাঝি। সে নদীতে তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মাছ ধরে, বিশেষত ইলিশ মাছ ধরে সে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।

কুবের গরিবের মধ্যেও গরিব, ছোটলোকের মধ্যেও ছোটলোক। তা সে হবেই বা না কেন? এ সংসারের সমস্ত দুঃখ-তাপ, ব্যথা- বেদনার সেও সমান অংশীদার। সংসারে তার অনেক অভাব, অনেক কষ্ট, তাই সে সৎ থাকার চেষ্টা করেও অনেক সময় সৎ থাকতে পারে না। এ কুবের তার বাড়িতে আশ্রিত ঘুমন্ত হোসেন মিয়ার পকেট থেকে দু-এক পয়সা কম্পিত

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হস্তে চুরি করতেও দ্বিধা করে না। তার বিবেক তাকে শাসায়। তাছাড়া পাছে হোসেন মিয়া জেনে ফেলে, সে ভয়েও সে তটস্থ থাকে। পরবর্তীতেও এ চুরির স্মৃতি তার মধ্যে সদা-জাগরুক ছিল। এ পাপবোধ ও অপরাধবোধ যেন তাকে সব সময়ই তাড়িয়ে বেড়াতো। সদাসর্বদাই হোসেন মিয়ার সামনে সে যেন এতটুকু হয়ে থাকত। তার মধ্যে অন্যান্য চুরির স্বভাবও আছে। প্রসঙ্গত, সবার অলক্ষে শেতল বাবুকে সে পয়সার লোভে মাছ দেয়। শেতল এক ঘুঘু। মাছ নিয়ে সে কেটে পড়ে। পয়সা দেয় না। কুবের বলে 'হালা ডাকাইত'। কুবের সহজ সরল পদ্মানদীর মাঝি– তাকে অনেকেই ঠকায়।

একেবারে নিম্নবিত্ত ও নিম্নতম পর্যায়ের মানুষ কুবের। তার মধ্যেও স্বাভাবিক দোষগুণ ও কামনা-বাসনাও আছে। তাছাড়া আছে তার একটি রোমান্টিক মন। সে তার স্ত্রী মালার বোন কপিলার প্রতি আদিম আকর্ষণ অনুভব করে। কপিলাও কুবের মাঝির মধ্যে তার প্রতি আদিম কামনা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। এ কুবের এক সময় ঘটি ও টাকা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে জেল খাটার ভয়ে হোসেন মিয়ার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। তার পর হোসেন মিয়ার কথা মতো সে হোসেন মিয়ার স্বপ্নের ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কপিলা বলে–'আমারে নিবা না মাঝি?' হ্যাঁ, সে কপিলাকেও সাথে নেয়। তার পর চিরকালের জন্য চলে যায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে। পেছনে রেখে যায়, তার সমস্ত অতীত জীবন আর পঙ্গু, অসহায় মালা ও তার সন্তান-সন্ততিদের। এক অসংস্কৃত, আদিম ও নিষিদ্ধ ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট কুবের কপিলাকে নিয়ে চলে যায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে।

ঘ. ২. কপিলা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকা কপিলা। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সে মালার বোন, সাংসারিক পরিচয়ে সে এক জনের স্ত্রী। মালার মতো সে পঙ্গু নয়। পুরুষের হৃদয়ে আদিম আবেদন সৃষ্টিকারী কপিলা কুবেরের সাথে যেন উদাসীনভাবে প্রেমের অভিনয় করে যায়। তার স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় সে বাপের বাড়িতে চলে আসে। অনেকদিন কাটায় সেখানে। বন্যার সময় সে কিছুদিন থাকে কেতুপুরে কুবেরের বাড়িতে।

চিরপঙ্গু মালার স্বামী কুবের তার শ্যালিকা কপিলার কিছু অসঙ্গত আচরণের কাছে অসহায় বোধ করতে থাকে। অবচেতন মনে কপিলার প্রতি সে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে কপিলা কিছুটা বাচাল ও চপল প্রকৃতির মেয়ে। সেই সাথে তার মধ্যে আছে যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি। সবকিছু পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে কপিলাকে বলা যায়, চতুর, চপল ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এক যুবতী। তার আচরণের মধ্যে কিছুটা আদিম ও অসংস্কৃত মনেরও পরিচয় লক্ষণীয়। যা সমাজের চোখে অনেকটাই নিন্দনীয়।

কপিলার অন্য পরিচয় সে এক জনের স্ত্রী। স্বামীর সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে বাপের বাড়িতে চলে এলেও সেই স্বামী ও সেই সংসারের প্রতি তার দুর্বলতা রয়েছে। নারীরা যতই চপল ও অসংস্কৃত হোক না কেন প্রকৃতিগতভাবেই সংসারের প্রতি তারা খুবই দুর্বল এবং অনুগত হয়ে থাকে। কপিলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

চপলমতি কপিলা ইচ্ছা করেই হোক আর অনিচ্ছাকৃতই হোক, কুবেরকে কিছুটা ব্যতিব্যস্ত করে। ফলে কুবের কিছুটা অসহায় বোধ করতে থাকে। তার পর সময়ের চলমান ধারায় কপিলার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। কপিলার সতীন মারা গেলে তার স্বামী তাকে আবার নিতে এলে কপিলা অনুগত স্ত্রীর মতো তার সাথে আবার আকুর-টাকুরে চলে যায়। এতে তার সংসার ও বিষয়বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে, এ কপিলাই আবার কুবেরের কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং পূর্ব প্রেমভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। কুবের কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, কপিলা তাকে ভালোবাসে। ভাবে, এসব তার ছলচাতুরী, এসব তার অভিনয়। কিন্তু কুবের যখন চুরির দায় এড়াতে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যেতে মনস্থ করে, তখন কপিলা তার অতীত জীবনের সবকিছু ফেলে এ যাত্রায় কুবেরের সাথী হয়। চিরসাথী। এভাবে এক আদিম, অসংস্কৃত ও নিষিদ্ধ প্রেম এক সময়ে সংসার ত্যাগের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

ঘ. ৩. হোসেন মিয়া

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের রহস্যময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়া। নোয়াখালির এ লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। কেতুপুর এলাকায় প্রথমে তাকে দীনহীন ও কপর্দকশূন্য এক

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ব্যক্তিরূপে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ কর্মী ও মানসিক শক্তির অধিকারী উদ্যমী এ ব্যক্তিটির ভাগ্য পরিবর্তনটা যেন ভেল্কিবাজির মতো মনে হয়। নানা দিকে নানা রকমের ব্যবসার মধ্য দিয়ে সে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। এ ব্যক্তিটি এক সময় কেতুপুর ও সংলগ্ন এলাকার দীন-দরিদ্র জেলে মাঝিদের পরম বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। সে হয়ে গিয়েছিল তাদের নিত্য দিনের সুখ-দুঃখের সাথী। হয়ত এসব সহযোগিতা দ্বারা সে নানা রকম মতলব হাসিল করত, তার প্রতি অনেক মানুষের হয়ত অনেক রকমের অভিযোগ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কেউ তার প্রতি কোনো অভিযোগও করতে পারত না আবার কোনো প্রতিশোধও নিতে পারত না। এর কারণ ছিল, দীন-দরিদ্র জেলেদের এক চরম অসহায়ত্ব। হোসেন মিয়াকে দেখলে তারা সব অভিযোগ ভুলে যেত আর তার প্রতি তারা গভীর আকর্ষণ অনুভব করত।

নোয়াখালি সন্দ্বীপ থেকে সুদূর পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে হোসেন মিয়া এক দ্বীপের পত্তনি নিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষদের নানা উপকারের মধ্য দিয়ে সে সেই এলাকা থেকে লোকজন নিয়ে ময়নাদ্বীপে লোকবসতি গড়ে তুলেছিল। সত্যি, লোকটার উদ্যম ও কর্মশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই ময়নাদ্বীপকে ঘিরেই হোসেনের স্বপ্নকল্পনার বেসাতি। এটাই যেন তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। সেখানে সে এমন একটা জনসমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে দলমত ও ধর্মমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একটা মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলবে। মনুষ্যত্ব ও মানবতাই হবে সে সমাজের প্রধান ভিত্তি।

এ উপন্যাসে হোসেন মিয়ার চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক যেন তাঁর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাকার করে তুলেছেন। সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায় যে, হোসেন মিয়া শুধু এ উপন্যাসের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি অভিনব চরিত্র।

ঘ. ৪. অন্যান্য

কুবের, কপিলা ও হোসেন মিয়া ছাড়াও আরো কয়েকটি চরিত্র এ উপন্যাসে রয়েছে। যেমন– রাসু, ধনঞ্জয়, পীতম মাঝি, মালা, গণেশ, আমিনুদ্দি, রসুল, ফাতেমা প্রভৃতি চরিত্র। এসব চরিত্রাবলির সমন্বয়ে এ উপন্যাসটিতে একটি সার্থক সমাজচিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়।

উপন্যাসটির পটভূমি

সবকটি চরিত্রই যেন এ উপন্যাসের পটভূমি এবং সমাজের বাসিন্দাদের অকৃত্রিম রূপায়ন। আশ্চর্য এবং অদ্ভুত শৈল্পিক সৌকর্য ও পরিমিতি দিয়ে লেখক অতি যত্নসহকারে চরিত্রগুলোকে গড়ে তুলেছেন। এরা এ সমাজের কেবারেই খাঁটি ও অকৃত্রিম চরিত্র। তারা একান্তভাবেই যেন এ সমাজেরই উপযুক্ত।

পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। এর ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ংকরী স্বভাবের কারণে একে বলা হয় 'কীর্তিনাশা' বা রাক্ষুসী পদ্মা। এ নদীর তীরের নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। এ নদী এলাকার কয়েকটি গ্রামের জেলেদের জীবনের নিখুঁত চিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এ পদ্মানদীর সাথেই তাদের জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠেছে।

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে উপন্যাসটির সার্থকতা

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম করলে প্রথমেই মুখে আসবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নাম। বিশ্বের একাধিক ভাষায় অনুদিত ও জননন্দিত এ উপন্যাসটি কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে।

যেমন– ১. এ উপন্যাসের পটভূমি। পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর সংলগ্ন যে এলাকাটির মানুষের জীবনচিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বাইরের সম্পর্ক বিবর্জিত। ২. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা একান্তভাবেই এ এলাকা ও পরিবেশের উপযুক্ত। ৩. এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত কৃত্রিমতা বিবর্জিত আঞ্চলিক ভাষা। ৪. উপন্যাসের বর্ণনার ভাষা সাধু, কিন্তু পাত্র-পাত্রীদের মুখের ভাষা আঞ্চলিক। উপন্যাসের লেখকের নিজস্ব বর্ণনার ভাষা ও পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রযুক্ত আঞ্চলিক ভাষার পরিমিত ও শৈল্পিক প্রয়োগ উপন্যাসটিকে উপভোগ্য ও সার্থক করে তুলেছে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বর্ষার মাঝামাঝি

পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মওসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েরই মাছ ধরবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায়, নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিস্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দু'জন লোক আছে, ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিন জনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিন জনের কোনো রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তাহার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এই দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুইটি বাঁশে-বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ করিয়া জাল নামাইয়া দেয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নিচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তাহারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তাহার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এক হাত খানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তাহারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জে মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কি না বলা যায় না। সকলেরই যদি এ রকম মাছ পড়ে দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোনো লাভের আশা থাকিবে না। তবে মাছের বড় ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের নাও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, 'যদু হে এ এ এ–মাছ কি বা?'

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, 'জবর'।

জবরের পরে সে নৌকা হইতে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায়, তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর!

ধনঞ্জয় বলে, 'সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।'

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, 'কাইল চাইরে নামবে! হালার মাছ ধরইরা জুত নাই।'

কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জাল জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীরটা আজ তাহার ভালো ছিল না। তাহার স্ত্রী মালা তাহাকে বাহির হতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এ বারও সে জমা লাইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাহাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তাহার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাহাকে এমনিভাবে দু-আনা চার আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া দাড়ায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে যে সে তাহার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া যায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে হাজার টাকা দামের জাল যাহারা পাতিতে পারে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এত বড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তাহার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়ার ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তাহার দু তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরসুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রেও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাত্রে একবার তাহারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, 'একটু জিরাই গো আজান খুড়া।'

'জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুইডা খেপ দিয়া ল।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কুবের বলিল, 'উহু, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভালো নাই।'

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছই-এর সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল-ছোবড়া গোলা করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচা করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

এক হাতে তীরের দিকে কোনাকুনি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।'

কলিকাটা তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়বাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্য সত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, 'ইঃ, আজ কি জাড় কুবির।'

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কাহারো সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, 'জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।'

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তাহার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোনো কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না এটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বার বার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তাহার কথার জবাব দেয় তাহাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কি না সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে-আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এ পক্ষের এই আনুগত্যের জন্য

তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল।

গণেষ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, 'একখান গীত ক দেখি কুবির।'

'হ্ গীত না তর মাথা।'

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে কিছু আসে যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। সে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না, গানেএই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

পূর্ব দিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তার পর রওনা হইল জাহাজঘাটের দিকে। সেইখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারি দিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়েছে। থাকিয়া থাকিয়া স্টিমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোনো স্টিমার ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টিমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। কলকাতা হইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের ও স্টেশনের দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটরবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোট-বড় নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায়-পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তাহার সংখ্যা নাই। নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে-স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।

মেছো-নৌকার ঘাটটি এক পাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লাইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে।

এই ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধহয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুইটা যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার পাঁচবারের বেশি।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পড়িয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। এক শ মাছ গোনা হইবা মাত্র তাহার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটা মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে এক সারি মাছ ও এক পরত করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা এক জোড়া উঁচুনিচু ও প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝা লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর কাছে গিয়া বলিল, 'কী কন?'

সে রাগ করিয়া বলিল, 'কী কন! জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।'

'মাছ তা নাই শেতলবাবু।'

'নাই কি রে, নাই? রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে যায় গা, যা। বড় দেইখা আনিস।'

কুবের মাথা নাড়িল, 'আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাহিয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।'

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, 'তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই?'

'তালি খানিক দাঁড়াও শেতলবাবু।'

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারি দিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লাইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে, সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসরই কাহারো নাই। চারি দিকে নজর রাখিয়া তিনটি মাছ কুবের এক সময় কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

'পয়সা কাইল দিমু কুবের।'

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, 'রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেখি।'

'কাইল দিমু কইলাম যে?'

'অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?'

'পয়সা নাই ত দিমু কী? কইলাম দিমু, নিয্যস দিমু।'

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, 'হালা ডাকাইত।' বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়টা গাল দিয়া কুবের নৌকায় গিয়া গলুয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল, একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোন দিনই পায় না। কুবের এই সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। টাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, 'কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ-চারের কম না অ্যাঁ?'

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, 'হ, চাইর শ না হাজার, দুই শ সাতপঞ্চাশখানা মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াই শর দাম দিছে।'

কুবের উঠিয়া বসিল।

'ইটা কী কও খুড়া। কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুই শ সাতাশইটা মাছ হইছিল?'

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, 'মিছা কইলাম না কিরে কুবির? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।'

কুবের নরম হইয়া বলিল, 'জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না। মাছ না কাল বেশি বেশি পড়ছিল তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।'

ঘুম ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ বুজিয়া আসিতে চায় আর নেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে-দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহার বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেয়া হইল। এখন বৈঠা ধরিলে চলে। উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনা চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাকচিল মাছরাঙা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট মতো একটি স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।

গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, 'না আইলি পারতি কুবির আইজ।' কুবের কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।

গণেশ বলে, 'মাথাটা টিপা দিমু নাকি?'

কুবের বলে, 'অঁ হঁ।'

গণেশ খানিক্ষণ ভাবিয়া বলে, 'হাল ধইরা যদি যাইবার পারস কুবের, আর আমি বৈঠা বাই, তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়।'

পূর্বদিকে গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। চারি দিক ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ায় বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয়, এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তার পর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ি উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তাহারই ফলে জেলেপাড়াটি জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বনিতে থাকে, পদ্মার

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনো দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনো দিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিকে গ্রামে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ও দিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ-গাঁয়ের মানুষকে ও-গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারি দিকে জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়িঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেই বার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেই বার রেহাই পায় না। পথ-ঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েক দিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও এক মাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে এক রকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে-বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।

নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা

ফসল কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলো হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

জেলেপাড়া নদী হইতে বেশিদূর নয়। তবে এইটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকার সমস্ত পথটা আবোল তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশে কুটুমবাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একাই সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবেরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, 'অ কুবির শুইনা যা।'

গণেশ বলিল,'কুবির জ্বরে বড় কাতর গো।'

নকুল বলিল, 'জ্বর নাকি? তবে যা বাড়িতে যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।'

এমন কথা শুনিয়া ব্যাপারটা না জানিয়া যাওয়া চলে না। কুবের উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, 'কিসের কাণ্ড নকুলদা?'

'শ্যাষ রাইতে তর বৌর ছাওয়াল হইছে কুবির।'

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?'

নকুল সায় দিয়া বলিল, 'হ। আমাগোর পাচী গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখানা পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রঙ হইছে গোরা।'

এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এই বার জোরে জোরে পা ফেলিয়াই বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। গণেশ ভারি খুশি। বার বার সে বলিতে লাগিল, 'পোলা হইব কই নাই কুবির? কই নাই ই বার তর পোলা না হইয়া যায় না?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, 'চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কি? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা।'

গণেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'তুই নি গোসা করিস কুবির?'

'করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?'

তাহার মেজাজের এই আকস্মিক উত্তাপ গণেশের কাছে বড়ই দুর্বোধ্য ঠেকিল। অত তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার, হিসাব করিবার ক্ষমতা নাই। বৌ থাকিলে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে হয় এই পর্যন্ত সে জানে, সুবিধা-অসুবিধার কথাটা ভাবিয়া দেখে না। তাহা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ আসিলে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁহার, গণেশ এটা বিশ্বাস করে। সুতরাং ছেলে হওয়ার সংবাদে কুবেরের রাগ করিবার কী কারণ আছে সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার চেষ্টাও করিল না।

বেড়া-দেওয়া ছোট একটি উঠানের দুই দিকে দুখান ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশি পরিচয় নাই। এদিকে ঘরের সংকীর্ণ দাওয়া একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়, ওটি আঁতুরঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কুবের ও দিকের দাওয়া-বিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা-দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ার চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের পাতা-বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেক জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়িকলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নিচটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বার বার সারাই করিয়া এবং চালানোর

সময় ক্রমাগত জল সেচিয়া বছর চারে আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তার পর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায়, ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটি কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মতো চিতার আগুনের সামান্যতম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কুবের তখন ছোট, পদ্মানদীর মাঝির ছেলে যতটুকু বয়সে পদ্মায় সাঁতার দিবার মতো পাকা সাঁতারু হইয়া উঠিতে পারে না, তত ছোট। ছোট একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি পুরানো নৌকার তলাটা কি করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ-তীরের ও-তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড় এবং শক্ত-সামর্থ্য হইলেও সে বিপদে পড়িত না, কিন্তু ছেলে-মানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন সে লম্বা কাঠের গুঁড়িটা হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া দিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।

কুবেরের পিসী আর তার বড় মেয়ে গোপী কুবেরকে দেখিয়াই চেঁচামেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারো সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসীর বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পিসী বলিল, 'শুলি যে ধন? বৌ ও দিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গোপী বলিল, 'বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখাল ধলা হইয়াছে বাবা। নকুলার মাইয়া পাচী কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয়। না পিসী?'

কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, 'নকুইয়া কি লো হারামজাদী। জ্যাঠা কইবার পার না?'

গোপী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?'

'কী কয়?'

'মাজা বাবু নি আমাগো বাড়ি আছে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে এক দলা পাঁক দিমুনে ছুইড়া মুখের মুধ্যে।'

'দিস্', বলিয়া কুবের ঝিমাইতে থাকে। খানিক পরে কুবেরের দাওয়া হইতে শিশুর জোরালো কান্দা শুনিতে পাওয়া যায়।

২

কয়েকদিন পরের কথা।

রথ উপলক্ষে কেতুপুরে কোনো রকম ধুমধাম হয় না। পদ্মার ও পারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেখানে। সোনাখালির জমিদারের ছোট একটি রথ বাহির হয়। সোনাখালি হইতে মোহনপুর অবধি দশ মাইল লম্বা একটা উঁচু পথ আছে; বর্ষাকালে এই পথটিই এ অঞ্চলে জলের নিচে ডুবিয়া যায় না। পথটির নাম ছ-কোশের পথ। নামের মধ্যে পথটির এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য কেমন করিয়া বাড়িয়া গিয়েছে বলা যায় না। সোনাখালির জমিদারের রথ এই পথ ধরিয়া আধমাইল খানেক গিয়া অন্নবাবার-মাঠের এক পাশে পড়িয়া থাকে সাত দিন, তার পর উল্টা-রথের দিন আবার রওয়ানা হয় জমিদার বাড়ির দিকে। স্থানটির অন্নবাবার-মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেক দিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক

কানা কড়ি ছিল না। শোনা যায়, এমনি আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড় বড় জমিদার-মহাজনেরা মণ মণ চাল-ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। যে সব বড় বড় উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রথের দিনে এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উল্টা-রথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এতে কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে, মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদীতীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ ও জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কয় দিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্ত মেলায় আমদানি হয়, এমন কি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহরী দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত রকমের বসে তাহার সংখ্যা নাই। গরু-ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁঠাল ও আনারসে মেলার একটা দিক ছাইয়া যায়, বড় বড় নৌকায় মালদহ ও ত্রিহুতের আম আসে। লেমোনেডের নামে বোতল ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল বিক্রয় হয় অজস্র। মেয়েরা সাধ মিটাই শাঁখা ও কাচের চুড়ি পরে, ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গভর্নমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটা প্রধান অঙ্গ। সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বালাখেলার কাছে। চারকোনা বাঁশের বেড়ার চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া পয়সার চার-চার বালা কিনিয়া বেশির ভাগ চাষাভূষারাই হরদম ছুঁড়িতে থাকে, রুদ্ধনিশ্বাসে চাহিয়া দেখে নিক্ষিপ্ত বালাটি লাল সালুতে সাজানো টাকা আধুলি সিকি ও দোয়ানির অরণ্যে অন্ধের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থির হইতেছে ফাঁকা জায়গায়। পুনরাবর্তিত ব্যর্থতা তাহাদের কোনো মনে যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। কত কাছাকাছি সাজানো মুদ্রাগুলি, ফাঁকা জায়গাই

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যে কম! ওদের মধ্যে যে বুঝি বৌ-এর জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা ও খাবার এবং সংসারের জন্য কী কী সব জিনিস কিনিতে অনেক দিনের চেষ্টায় জমানো কটা টাকা আনিয়াছিল, দেখে, সন্ধ্যার সময় দূরের মানুষ যখন বাড়ির দিকে শ্রান্ত পা বাড়াইয়াছে বেচারির কাছে বিড়ি কিনিবার পয়সাও নাই! আজীবন উপার্জন করিয়া সে পরকে খাওয়াইছে, সে যে কী নিরীহ গৃহস্থ! কারো কথা না ভাবিয়া আজ সে এ কী করিয়া বসিল! এ বেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না?

রথের দিন সকাল হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল। বেলা বাড়িলে নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।

কুবের তখনও ঘুমাইতেছিল। গণেশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, 'চল, কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।'

কুবের প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া বলিল, 'বয় গণশা, বয়। অ পিসী, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো? আলো গোপী, আমারে নি এক ঘটি জল দিবার পারস?'

ঘরে মুড়ি ছিল না। কদাচিৎ থাকে। পিসী চারটি চিড়া আর একটু গুড় দিয়া গেল। গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে চিবাইতে কুবের বলিল, 'খা গণেশ। রথের বাদলা নামছে দেখছস?'

'হ।'

'চালায় ছন চাপান লাগে। রাইতের বাদলায় ঘরে জল পড়ছিল, দেখ!'

গণেশ চাহিয়া দেখিল, জল পড়িয়া ঘরের একটা কোণ সত্যি ভাসিয়া গিয়াছে। জিহ্বায় সে একটা আফসোসের শব্দ করিল। বলিল, 'কোণ দিয়া পড়ছে তাই বাঁচান, না তো জিনিসপত্তর সকল ভাইসা যাইত। চালায় চাপাইবি নাকি ছন আইজ? মেলায় গেলি তো সময় পাবি না?'

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ছন কই? নাই তো?'

'ছিল যে ছন?'

গোপীর মার বিছানায় পাইতা দিছি।'

ব্যাপারটা বুঝিয়া গণেশ গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলিল, 'ভালা করছস। যা বাদলা!'

ধীরে ধীরে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল। গণেশ যে তাগিদ লইয়া আসিয়াছিল সে যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। খাওয়া বন্ধ করিল গণেশ আগে। বাড়ি হইতে সে দুটি পান্ত খাইয়া আসিয়াছে, কুবের খাক। ঘটিটা উঁচু করিয়া মুখে ঢালিয়া সে জল খাইল। আরও দুটি চিড়া মুখে দিয়া বাকিগুলি কুবের দান করিয়া দিল তাহার বড় ছেলেকে। বলিয়া না দিল চিড়াগুলি সে একাই খাইতে পারে সন্দেহ করিয়া বলিল, 'চণ্ডীরে দুগা দিস লখ্যা, আঁই?'

লখ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উহুঁক। উয়ারে পিসী দিব।'

'পিসির আর নাই। দে কইলাম লখ্যা।'

কুবেরের দুই ছেলে উলঙ্গ। বর্ষার ভাপসা গুমোটে ঘামিয়া তাহাদের শীর্ণদেহ চকচক করিতেছে। পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দু জনের একটা ছোটখাট কলহ বাঁধিয়া গেল। কুবের আর চাহিয়াও দেখিল না। এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক। দু দিন পরে জীবন-যুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে?

ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সঙ্কীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মত ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসী দাওয়ার এক পাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওখানেই ভিজা স্যাঁতসেতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কী? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া! বাড়িতে ঘর থাকিলেও বরং একটা ঘর

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

অপবিত্র করিয়া ফেলা উচিত। দুখানা কুঁড়ে যাহার সম্বল তাহার স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম দিবে? ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যাহারা আরও বেশি ভদ্রলোক তাহাদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড় ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তাহার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে। ভালো করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার ছনগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেলকোম্পানীর কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে?

হঠাৎ এক মিনিটেরও কম সময় ঝুপঝুপ করিয়া জোরে বৃষ্টি হইয়া গেল। তারপর যেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল। গণেশ দরজার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'যাবি না কুবির?'

কুবের বলিল, 'হ, ল যাই। আইচ্ছা তুই ক দেখি গণেশ, হীরু জ্যাঠার ঠাঁই দুগা ছন চামু নাকি? দিব না?'

গণেশ বলিল, 'হীরুজ্যাঠা ছন দব? জ্যাঠারে তুই চিনস না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস? বিহানে ঘরে ফিরা্যা শুমু, বৌ কয় চাল বাড়ন্ত! খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে-চাল বাড়ন্ত! বৌরে কইলাম, হীরু জ্যাঠার ঠাঁই দুগা কর্জ আনগা। দুপুরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বৌর জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কি, বিষ্যুদবার কার্জ দেওন মানা।'

কুবের সবিস্ময়ে বলিল, 'হ? তার নিজের জ্যাঠা না!'

'নিজের জ্যাঠা বইলাই পিরীত য্যান বেশি কুবির। খালি নিবার পারে, দিবার পারে না।'

এই কথাগুলি বলিতে পারার মধ্যে গণেশের পক্ষে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। কুবের শিরশ্চালনায় সায় দিয়া বলিল, 'আমার ঘরে পাঠালি না ক্যান বৌরে?'

গণেশ যেমন বোকা, তেমনি সরল। সে বলিল, 'তুই চাল পাবি কনে?'

এ কথায় অপমান বোধ করিয়া কুবের উঠিল রাগিয়া।

'চাল পামু কনে! ক্যান আমরা ভাত খাই না? গরিব বইলা চাল কর্জ না দেওয়নের মতো গরিব আমি না, জাইনা থুইস!'

কুবের রাগে ও গণেশ লজ্জায় খানিক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'গোসা করলা নি কুবিরদা?'

মাঝে মাঝে, কুবেরের রাগের সময়, ভীরু গণেশ তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি সম্বোধন করে।

'করুম না। গাও জ্বালাইনা কথা কস যে! আজান খুড়া বইয়া আছে, ল যাই।'

কুবের উঠানে নামিয়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া উঠানটা কাদা ও পিছল হইয়া আছে। গৃহাঙ্গনের এই নোংরা পচা পাঁকের চেয়ে নদীতীরের কাদা অনেক ভাল। সেই কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া গেলেও যেন এ রকম অস্বস্তি বোধ হয় না। বাড়ির পাঁকে পায়ে হাজা হয়, পাঁক ঘাঁটিয়া যাহার জীবিকা অর্জন করিতে হয়, সে পাঁকের সংস্পর্শেই তাহারও পা কুটকুট করে আকস্মিক ক্রোধে কুবের ছেলেমানুষের মত উঠানে একটা লাথি মারিল। পায়ের পাতার একটা পরিষ্কার ছাপ মাত্র উঠানে পড়িল, আর কিছু হইল না।

আঁতুড় হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, 'অ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।'

মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কিয়ের সমান! ছন না পাইতা ভিজা ভিতে শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা শুইয়া থাক। চালার লাইগা ছন লাগে, আইনা লমু।'

'হোসেন মিয়া কইছিল খড় দিব?'

'হোসেন মিয়া কইলকাতা গেছে।'

মালা আফসোস করিয়া বলিল, 'কবে গেল? আগে নি এক বার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম-কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কলিকাতা হইতে মালা এক পয়সায় ছুঁচ আনিতে দিত শুনিয়া কেউ হাসিল না। পিসী বরং মালার কথায় সায় দিয়াই কী যেন বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। জবাব দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুবেরের পায়ে আঙুলের ফাঁকে হাজার ঘায়ে বিষাক্ত পাঁক কামড়াইতেছিল। সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নদীতীরে নৌকায় তাহাদের কাজ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা লইয়া তাহারা সোনাখালির মেলায় যাইবে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা থাকিবে, কেতুপুর ও আশপাশের গ্রাম হইতে এমন যাত্রীও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যাহারা ভাড়া দিয়া মেলায় যাইবে। নৌকাটা একটু সাফ করিয়া একটা অস্থায়ী হোগলার ছই খাটাইয়া দেওয়ার দরকার। নৌকার ছোট পালটি মেরামত করিবার জন্য নামানো হইয়াছিল, বাঁশের মাস্তুলে সেটিও আবার ঠিক করিয়া খাটাইতে হইবে। বর্ষাকালে বাতাস প্রায় সোনাখালির দিকেই বহিতে থাকে, গুমোট করিয়া সামান্য বাতাস যদি উঠে, পাল তুলিয়া মেলায় পৌঁছিতে আজ এক ঘণ্টা সময়ও লাগিবে না।

নদীর ধারে পৌঁছিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল ছাতি মাথায় দিয়া হোসেন মিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘর ছাইবার জন্য হোসেনের কাছে বিনামূল্যে কিছু ছন পাইবার সম্ভবনা ছিল, তাহাকে দেখিয়া কুবেরের খুশি হওয়াই উচিত ছিল। তবু লোকটার আবির্ভাব চিরদিন যে দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায় আজও সেই আশঙ্কাই হঠাৎ তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। চুপি চুপি বলিল, 'হোসেন মিয়া রে গণেশ!'

'তাই তো দেহি!'

একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়ি তাহার নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বৎসর হইতে কেতুপুরে বাস করিতেছে। বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না, পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রঙ লাগায়, কানে আতরমাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে। প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ

চুল-ঘসা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত। জেলেপাড়া-নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় বৈঠা বাহিত। আজ সে তাহার বেঁটে-খাটো তৈল-চিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে। এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয়তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল-গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটি সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনোখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারো তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা গল্পমাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আট দিন সময় লাগে। তার পর কয়েক দিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায়। পনেরো দিন, এক মাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছু দিন পর দুশ গরু-ছাগল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।

বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সব সময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে। সে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নিমর্মভাবেই দেয়, কিন্তু তাহাকে কেহ কোন দিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তাহার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তাহার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনো সে জেলেপাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইসব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নিচে নামাইয়া আনে। না, মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই, জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলনসীমান্তে তাহারা বাস করে, মিত্র তাহাদের কেহ নাই। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া গোপনে তাহার গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়তো পারে। বলে না শুধু এই জন্যে যে বলা নিরর্থক। তাহাতে কোন লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা করিবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইলে কার কী লাভ হইবে? তাহার চেয়ে বর্ষাকালে ঘরের ফুটা চাল যদি একটু মেরামত হয় উপবাসের সময় বিনা সুদে যদি কিছু কর্জ মেলে, তাহাই ঢের লাভ।

হোসেন মিয়ার গোপন মতলবের দুটো-একটার খবর যে জেলেপাড়ার লোকেরা রাখে না তাহা নয়। জেলেপাড়ার তিনটি পরিবার উধাও হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়া যে ছেলে-বুড়ো স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এক-একটি সমগ্র পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিত প্রথমে কেহ তাহা টের পায় নাই, পরে জানা গিয়াছিল নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপে প্রজা বসাইয়া সে জমিদারী পত্তন করিতেছে। সে দ্বীপ নাকি গভীর জঙ্গলে আবৃত, শহর নাই, গ্রাম নাই, মানুষের বসতি নাই, শুধু আছে বন্যপশু এবং অসংখ্য পাখি।

কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত্য উপবাস-খিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। লোভ দেখাইয়া, আশা দিয়া, এক-একটি নিরুপায় পরিবারকে সে এই দ্বীপে লইয়া যায়, সৃষ্টির দিন হইতে কখনো আবাদ হয় নাই এমন খানিকটা জমি দেয়, থাকিবার জন্য ঘর দেয়, আবাদের জন্য দেয় হাল-বলদ ও জঙ্গল কাটিবার জন্য যন্ত্রপাতি। অন্যান্য স্থান হইতেও আরও কতগুলি পরিবারকে সে ওখানে লইয়া গিয়াছে কে জানে, কিন্তু কেতুপুরের জেলেপাড়ার তিনঘর মাঝিকে

সে যে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করিয়াছে এ খবর জেলেপাড়ার কাহারো অজানা নাই। তবু জানা না-জানা তাহাদের পক্ষে সমান। মাথা নিচু করিয়া তাহারা হোসেন মিয়ার দেওয়া উপকার গ্রহণ করিবে। মনুষ্য-বাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত করার আহবান আসিলে যত দিন পরে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে, যে দিন পারিবে না সে দিন স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।

তাই মনে মনে লোকটাকে ভয় করিলেও কাছে গিয়া কুবের বলিল, 'ছালাম মিয়া বাই।'

হোসেন বলিল, 'ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি? কাহিল মালুম হয়?'

'জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আইলেন কবে?'

'আইজ আইলাম। আর গণেশ বাই, খবর কী? মেলায় যাবা না?'

গণেশ ঢোক গিলিয়া বলিল, 'যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু! পোলা-পানেরা মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান?'

'গুমটি দিছে, বাদাম চলব না। সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফিরা্যা আইও, আসমান ভাল দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝড় হইবার পারে।'

কুবের আকাশের দিকে ও নদীর দিকে চাহিল। পাতলা কুয়াশার মতো মেঘের আকাশ ভরিয়া আছে, নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুক গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতে অসংখ্য ছোট ছোট বুদবুদ উঠিয়া ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে। নদীর অপর তীর চোখে পড়ে না, মাঝখানের নৌকা পর্যন্ত অস্পষ্ট। আরও এ দিকে একটি স্পষ্টতর নৌকার দিকে চোখ রাখিয়া কুবের সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, 'যামু না মেলায়? বারণ করেন নাকি মিয়া বাই?'

হোসেন বলিল, 'যাবা না ক্যান? ডর কিসের? আসমান দেইখা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে!'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সায় দিয়া কুবের নৌকায় উঠিল। মুসলমান মাঝির দুটি নৌকা ইতিমধ্যে মেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দুটি নৌকাই একসঙ্গে ছাড়িয়া গেল। নদীর জল তুলিয়া নৌকা ধুইতে ধুইতে কুবের এক সময় চাহিয়া দেখিল, হোসেন চলিয়া গিয়াছে। চালার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ছনের কথাটা এতক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে, হোসেনকে বলিয়া রাখিলে ভালো হইত। লোকটা এই আছে, এই নাই। ছনের জন্য কাল সকালে হয়তো ওর বাড়ি গিয়া শুনিবে, রাতারাতি ও ঢাকায় পাড়ি দিয়াছে। কবে ফিরিবে? কে তাহা জানে।

হোগলার ছাউনি বাতার সঙ্গে বাঁধিতে বাঁধিতে কুবের হঠাৎ সচকিতা হইয়া বলিল, 'কে হাঁকে রে গণেশ?'

বহু দূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানব-কণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা পূর্ববঙ্গের মাঝির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

ধনঞ্জয় মন দিয়া শোনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেডা? কী কয়?'

কুবের কহিল, আমাগোর রাসু।'

ধনঞ্জয় অবাক হইয়া গেল।

'বিন্দা মাঝির পোলা? কস কী কুবির। শুনছস নি ঠিক?'

'রাসুর গলা চিনি না খুড়া? অখনি আইব, দেইখো।'

ধনঞ্জয়ের বিস্ময় কমিতে চায় না। বহু দূরের নৌকাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'রাসু না হোসেন মিয়ার দ্বীপে গেছিল?'

'হ'।

'আইল কিবা?'

কুবের বিরক্ত হইয়া কহিল, 'কিবা কমু খুড়া? আহুক, জিগাইও। হোসেন মিয়া ছাইড়া দিবার পরে, ও নিজে পালাইয়া আইবার পারে, না জিগাইয়া কি কওয়ন যায়?'

খানিক পরে আবার হাঁক আসিল, এ বার আরও স্পষ্ট। হাঁকের আওয়াজে যে একটি উৎসুক সুর ছিল তিন জনের কানেই তাহা ধরা পড়িল। গণেশ কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া কী বলিতে গিয়া হাঁ করিয়া কিছুই বলিল না। হাঁকের জবাব দিবার জন্য কুবের সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ পর একটা জীর্ণ পুরাতন নৌকা আসিয়া ভিড়িল পাশে। দু জন অচেনা মাঝি নৌকা বাহিয়া আসিয়াছে। ভিন গাঁয়ের নৌকা। নৌকার খোলটা কাঁঠালে এমনভাবে বোঝাই করা হইয়াছে যে, নৌকার প্রান্তভাগ জলের উপর কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভাসিয়া আছে। উপরে কোনো রকম আবরণ নাই, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে মাঝি দু জন এবং রাসু তিনজনই ভিজিয়া গিয়াছে। তাড়া দিয়া রাসুকে এ নৌকায় নামাইয়া দিয়া মাঝি দুজন বোধহয় বিড়বিড় করিয়া তাহাকে গাল দিতে দিতেই তৎক্ষণাৎ আবার ঠেলা দিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়া বৈঠা ধরিল। পদ্মানদীর চিরন্তন রীতি অনুসারে কুবের জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে?'

জবাব দিবার রীতিও চিরন্তন। তাহারা সক্রোধে বলিল, 'সুলপী থেইকা আইলাম, যামু মেলায়।'

রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাহাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদের ফলপ্রসূ নয়-এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মতো দুরবস্থায় পড়িয়া আবার যখন কেহ পদ্মা পার করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইবে এমনিভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহারা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা তাহারা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বৈঠা বাহিবে। ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়–ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই এ নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।

নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিক ক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'আমি আলাম গো কুবিরদা।'

'কন থে আলি রাসু?'

'কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা মুখে রাও সরে না, কত কাল পরে ফিরে আলাম।'

কুবের ও গণেশ তাহার চোখে জল দেখিতে পাইল। ধনঞ্জয় পড়িয়াছিল তাহার পিছনে। সে উপস্থিত থাকিতে রাসু যে আসিয়া পৌঁছিয়াই কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া উঠিল ইহাতে মনে মনে সে ঈর্ষাতুর ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাসুর আবির্ভাবে উত্তেজনা তাহারও কম হয় নাই। তাহা গোপন করিয়া শান্ত উদাসভাবে সে বলিল, 'বয় রে রাসু, বয়।'

কুবেরকে ছাড়িয়া রাসু হোগলার নিচে নৌকার আধভেজা পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল। হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া পরনের জীর্ণ বসনে ঘষিয়া হাতে-লাগা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। তিন জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাহার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহটির দিকে। তিন বছর আগে হোসেন মিয়ার সঙ্গে সপরিবারে সে যখন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল দেহ তখন তাহার অবশ্য বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না, কিন্তু এমনভাবে ভাঙিয়াও সে পড়ে নাই। রাসুল মাথায় বড় বড় চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, কয়েকটা ঘা এখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই। দুটি পা-ই তাহার হাঁটুর কাছ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা। গায়ের চামড়া যেন তাহার আলগা হইয়া শুকাইয়া শক্ত ও কালো

হইয়া উঠিয়াছিল, এখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজা জুতার চামড়ার মতো স্যাঁতস্যাতে দেখাইতেছে। একটু আগে বহুদূর হইতে অত জোরে হাঁক দিবার শক্তি সে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া কুবের অবাক হইয়া রহিল।

রাসু ঝিমাইয়া পড়িতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'ময়নাদ্বীপ থেইকা আলি না রাসু?'

'হ।'

'পলাইয়া আইছস?'

'হ, বৈশাখ মাসে।'

'বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই?'

'নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবারে আইলাম সুলপী। কমুনে আজান খুড়া, সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি—অ কুবিরদা, কিছু নি দিবার পার?'

তখনকার মত কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাসুকে সঙ্গে করিয়া তিন জনে গ্রামে ফিরিয়া গেল। ধনঞ্জয়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই রাসুর আবির্ভাবের বার্তা রাষ্ট্র হইয়া গেল জেলেপাড়ার সর্বত্র। কিছু ক্ষণের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের উঠান জেলেপাড়ার কৌতুহলী ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-পুরুষে ভরিয়া উঠিল। সকলের চোখে অপার বিস্ময়। তিন বছর আগে সকলে যাহাকে মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিয়াছিল, তিন বছর যাহাকে সকলে এক রকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ সে আবার ফিরিয়া আসিল কোথা হইতে? রাসুর মামা আশি বছরের বুড়া পীতম মাঝিও ন্যুব্জ দেহ লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া আসিয়া পড়িল। রাসু দাওয়ার উপর চাটাইয়ে বসিয়া মুহ্যমানের মতো একদা পরিচিত এই জনতার দিকে স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কাছে গিয়া ক্ষীণদৃষ্টি পীতম মাঝি তাহাকে অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিল। চিনিতে পারিয়া ভাবাবেগে হাত হইতে লাঠিটা খসিয়া যাওয়ায় হঠাৎ ভাগ্নের গায়ের উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সে উঠিল কাঁদিয়া। হুমড়ি খাইয়া পড়িবার আঘাতে নয়, কাঁদিয়া উঠিল সে। এই বলিয়া যে রাসু একা ফিরিয়া আসিল, আর সকলে কই?

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যে আহারের পীড়নে রাসু একদিন সপরিবারে ঘরছাড়া হইয়াছিল, দু মুঠো চাল দিয়া পীতম তাহা লাঘব করিবার কোনো চেষ্টাই করে নাই। তাই বলিয়া তাহার এই কান্না যে অশোভন হইল তাহা নয়। সেই দুর্দিনে মামার স্বাভাবিক উদাসনতার স্মৃতি রাসুও মনের মধ্যে পুষিয়া রাখে নাই। শুধু সেই দুর্দিনের স্মৃতি নয়, সবই যেন সে এতক্ষণ ভুলিয়াছিল, তাহার দুঃখ-বেদনার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। পীতমের কান্না শুনিয়া সেও হঠাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল ঃ 'আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফির‍্যা আইলাম।'

কান্নার মধ্যেও পীতম চমকাইয়া উঠিল। একেবারে বেখাপ্পা সুরে প্রশ্ন করিল, 'কস কী রাসু, সব কটা গেছে?'

রাসু সায় দিয়া বলিল, 'সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই।'

কেউ নাই। এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, একুনে এই চার জনকে সঙ্গে লইয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল, হোসেন মিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ ময়নাদ্বীপের উপনিবেশে একে একে চার জনেই মৃত্যুর দেশে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এই গভীর শোকাবহ সংবাদে কেতুপুরের জেলেপাড়া নিবাসী নরনারী মূক হইয়া গেল। অথচ এই সংবাদ রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতোও বিস্ময়কর নয়। সকলেই ইহা জানিত। সমুদ্রের মধ্যে যে দ্বীপ সৃষ্টির দিন হইতে মানুষ বাস করে নাই সেখানে গিয়া কাহারো বাঁচিবার উপায় আছে? রাসুরা যখন সেখানে যায় তখন সকলে নিশ্চিত জানিয়াছিল তাহারা মরিতে যাইতেছে। রাসু যে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে আশ্চর্য তো এইটুকুই। এমনি আশ্চর্য যে রাসুকে সম্মুখে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হইতে চাহে না যে সে সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ধনঞ্জয়ের বৌ বুতির মা একটি কলাই-করা পাত্রে খানিকটা ঘোল আনিয়া দেয়, রাসু চোখের পলকে এক নিঃশ্বাসে তাহা গিলিয়া ফেলে। সমবেত জনতা এতক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক-একটি সুবিধাজনক স্থান গ্রহণ করিয়া বসিয়া পড়িলে রাসুকে ঘিরিয়া একটি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সভার সৃষ্টি হয়। তারপর একে একে উঠিতে থাকে প্রশ্ন। জবাবে রাসুর প্রত্যেকটি কথা সকলে সাগ্রহে গিলিতে থাকে।

পীতম শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'ময়নাদ্বীপে বাঘ-সিঙ্গি আছে না রাসু?'

'আছে না? বাঘ-সিঙ্গিতে বোঝাই।'

বলিয়া সকলের মৃদু শিহরণ লক্ষ্য করিয়া এই অর্ধমৃত অবস্থাতেও গর্বের উত্তেজনা রাসুকে যেন নবজীবন দান করে, ভাঙিয়া পড়িবার ভঙ্গিতে বসিয়া থাকার বদলে হঠাৎ সে হইয়া যায় সিধা। বলে, 'বাঘ-সিঙ্গি! বাঘ-সিঙ্গির নামে ডরাইলা? কী নাই ময়নাদ্বীপে কও? সাপ যা আছে এক-একটা, আস্ত মাইনষেরে টাইনা নিয়া যায়। রাইতে সুমুন্দরের কুমির ডাঙ্গায় উঠ্যা আইয়া মাইনষেরে টাইনা নিয়া যায়—'

'হ', বলিতে বলিতে মুখ খুলিয়া যায় রাসুর, আর শুনিতে শুনিয়ে হাঁ হইয়া যায় তাহার শ্রোতাদের মুখগুলি। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ, এমন ভীষণ স্থান সেটা?

যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বৌরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নূতন কাঁচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাঁচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তাহা নয়, কোন না কোনরূপে সোনাখালির মেলায় আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা— এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন, আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটি মাছ দিয়া দিনের পর দিন আধ পেট ভাত খাইয়া থাকে—খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের? কুবেরের প্রতিবেশী বুড়া সিধু দাস একটি পয়সা সম্বল করিয়া মেলায় গিয়াছিল, পয়সাটি সে খরচ করে নাই। কিন্তু মেলা হইতে সে যে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহার বৃহৎ পরিবারের আজ উৎসবের অন্ত

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নাই। ভিক্ষা সিধু করে নাই, বাগাইয়াছে। সারা দিন মেলায় ঘুরিয়া যেন-তেন প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রহ করিয়াছে তিনটি দাগধরা প্রকাণ্ড ফজলী আম, একটা তুলতুলে পাকা আস্ত খাজা কাঁঠাল, সের তিনেক একত্র মেশানো চাল ডাল খুদ আর খাসির একটা মাথা। গরিবের উৎসবের আর কী চাই? কুড়ানো ফেলা জিনিস। খাসির মাথাটা ধরিতে গেলে সে এক রকম চুরিই করিয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু তাতে কী? ভিক্ষা সিধু কারো কাছে চায় নাই, পয়সা সিধু কারো চুরি করে নাই।

কুবেরের উঠানে দাঁড়াইয়া সিধু বলে, 'আমারে না নিয়া ফির‍্যা আলি কুবির?'

দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচের লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলে, 'তুমি না হীরু জ্যাঠার নায় আগেই ফিরা আইল্যা?'

সিধু দাওয়ায় উঠিয়া যায়।

'তা আইলাম, কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না? কোঁচটা কিনা আনলি সন্দ করি। নিল কত?'

'আষ্ট আনা।'

আট-দশ হাত লম্বা সরু তল্লা বাঁশের ডগায় দশ-বারোটি তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা বসানো মাছমারা যন্ত্রটি সিধুও গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখে। গোড়ার দিকটা ধরিয়া অন্ধকার উঠানে ছুঁড়িবার অভিনয় করিয়া বলে, 'ভাল মন্দ না, জিতছিস কুবির। কাল-পরশুতক আমিও একটা কিনা লমু।'

সিধুর মতলব কুবের ঠিক বুঝিতে পারে না। কোঁচটি সে ঘরের মধ্যে কোনায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসে। বিকালে বৃষ্টি হইয়া গুমোট করিয়া আছে; আকাশে বিশেষ মেঘ নাই বটে কিন্তু কখন যে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে বলা যায় না। রাসুকে পীতম তাহার বাড়ি লইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো আবার তাহাকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছে। সেখানে, নিজের নির্বাসনের কাহিনী বলিয়া রাসু সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা না পাইলে কুবেরও সেখানে গিয়া বসিত। পিসী

হাঁড়িতে ভাত ফুটাইতেছে, না খাইয়া রাসুর রোমাঞ্চকর গল্পের লোভেও কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা এখন তাহার নাই।

সিধু বসিয়া বসিয়া বাজে কথা বলে, শিথিল ছাড়া-ছাড়া তাহার ভাষা, অনির্দিষ্ট অবান্তর বিষয়বস্তু। কুবের আনমনে সায় দিয়া যায় ঃ 'হ!'

পেটে ক্ষুধার জ্বালা, মনে পীতম মাঝির বাড়ি যাওয়ার তাগিদ, বুড়া সিধুর বকবক শুনিতে শুনিতে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

শেষে সিধু যেন প্রসঙ্গক্রমেই বলে, 'খাসির একটা মাথা আনলাম কুবির! মস্ত মাথাখান-মইয়ের মতো দুটো সিং।'

'নিল কত?'

'শ্যাষ বেলা সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ-ম্যাষ চৌদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবারে কইলাম, তা কয়, তেলমরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ন্ত।'

সিধুর কথা শুনিবার সমস্ত আগ্রহ কুবের সহসা হারাইয়া ফেলে। পিসীকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাত হইল পিসী?' একেবারে সে পিছন ফিরিয়া বসে সিধুর দিকে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সিধু উঠিয়া যায়। বাঁশের একটা টুকরিতে খাসির কোটা মাথাটা আনিয়া কুবেরের সামনে ধরিয়া বলে, 'দেখ কুবির, মিছা কই নাই। ঘাড়ের কাছে খাসা খানিক মাংস ছিল, এই দেখ'-টুকরির কাছে মুখ লইয়া ঠাহর করিয়া সিধু কয়েক টুকরো মাংস বাছিয়া কুবেরকে দেখায়। করুণ নয়নে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, 'ত্যাল-মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব-অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাঁই প্যাঁজ-রসুন মাইগা আইনা–'

'আমারে দেখাও ক্যান? রাঁধগা ব্যানুন।'

সিধু এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, 'ত্যাল-মরিচ আর এক মুঠা চাল দে কুবির। তরেও দিমুনে ব্যানুন।'

কুবের সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, 'দিবানি নিয্যস?'

সিধু আহত হইয়া বলে, 'দিমু না? কস কী কুবির? তরে না দিয়া যামু কই?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তেল-মশলা এবং চাল লইয়া সিধু উঠিল। আঁতুড় হইতে মালা বলিল, 'বুড়া কী বজ্জাত? মাথার ভাগ দিব না আইঠা কলা দিব, দেইখো।' কুবের উদাসভাবে বলিল, 'না দেয় না দিব। আজ তো শ্যাষ না, আরেক দিন আইলে মাইরা খেদাইয়া দিমু—আমার লগে চালাকি কইরা যাইব কই?'

ভাত নামিলে ইলিশ মাছ ভাজা আর লঙ্কারক্তিম তরকারি দিয়া ফেনসমেত তপ্ত অন্নে কুবের মুহূর্তের মধ্যে পেট ভরাইয়া ফেলিল। গোপীকে খানিক পরে একটা বাটি লইয়া গিয়া সিধুর কাছ হইতে খাসির মাথার ব্যঞ্জন আনিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পীতম মাঝির বাড়ি জেলে পাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে। গোয়ালের ভিতর দিয়া তাহার বাড়িতে ঢুকিতে হয়; গোয়ালের একদিকে বাঁধা থাকে দুটি শীর্ণ গরু, অন্যদিকে থাকে পীতমের প্রসিদ্ধ বেড়াজাল, এত বড় জাল কেতুপুরের আর কাহারও নাই। বাড়িতে উঠানের বালাই নাই, গোয়াল পার হইয়া ঢুকিতে হয় প্রকাণ্ড একটা ঘরে। দু-পাশের ছোট দুখানা ঢুকিবার দরজাও এই ঘরের ভিতর দিয়া। কার্পণ্য ও বেড়াজালটির মতো বাড়ি করার এই খাপছাড়া ঢংও পীতমের কম প্রসিদ্ধ নয়, লোকে নাম দিয়াছে কয়েদখানা। ঘরের পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার পরে একটা ডোবা। ডোবার ও দিক বাঁশবনের পরে আর মানুষের বসতি নাই, বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত আষাঢ়ের গোড়াতেই এখন অর্ধেকেরও বেশি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবনে জেলেপাড়ার প্রায় সকলেরই পরিচিত এক জোড়া পাঁচ ফুট লম্বা গোখুরা সাপ বাস করে। ডোবায় থাকে কয়েকটি গোসাপ।

বড় ঘরখানায় সভা রীতিমতই বসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের অবাক হইয়া দেখিল, সভাপতি রাসু নয় হোসেন মিয়া। পীতমের কাঠের সিন্দুকটার উপরে কাঁথা ভাঁজ করিয়া পাতিয়া হোসেনকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। রাসু মিশিয়া গিয়াছে একেবারে ভিড়ের মধ্যে। সকলের মুখেই একটা দারুণ অস্বস্তির ভাব, আড়চোখে সকলে হোসেন মিয়ার দিকে চাহিতেছে। এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে ঘরের আবদ্ধ বাতাস হইয়া উঠিয়াছে দূষিত, গরমে

হোসেন মিয়ার কপালে বড় বড় ফোঁটায় জমিয়া আছে ঘাম। এ দিকে ও দিকে চাহিয়া কুবের টপ করিয়া সকলের পিছনে বসিয়া পড়িল। হোসেন মিয়া এখানে আসিয়া জুটিল কোথা হইতে? এত লোকের সামনে রাসুর সঙ্গে যখন তাহার মুখোমুখি হইয়া গিয়াছে, কী কাণ্ডটা আজ হয় দেখ!

কুবের বিষাদ বোধ করে। আহা এত বড় একটা কর্মঠ শক্তিশালী লোক, একগুঁয়ে সম্মানকামী লোক, কপালের ফেরে বড় জব্দ হইয়া গেল। রাসু তাহাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরাইয়া দিয়াছে সকলের কাছে। যে এত প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, আজ বুঝি তাহার মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও বাধিতেছে। সোজাসুজি অপমান করিবার সাহস হয়ত কাহারো হয় নাই, কিন্তু কৌশলে নানাভাবে নানা ইঙ্গিতে কত লজ্জাই লোকটাকে সকলে না জানি এতক্ষণ দিয়াছে। কুবের এমনি মমতা বোধ করে যে সে ভাবিতে থাকে, পারিলে আজ সে হোসেন মিয়ার পক্ষই লইত। লোভ দেখাইয়া আশ্বাস দিয়া হোসেন মিয়া যে রাসুর স্ত্রী-পুত্রকে সুদূর ময়নাদ্বীপে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে, কোন্ যুক্তিতে তাহার কীর্তি সে সমর্থন করিত কুবের তাহা জানে না। সে যাহাকে ভয় করে, এত লোকের সামনে তাহার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল। অন্ধ আবেগের সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল, যাহারা পঙ্গু, অসহায় জীব, শক্তিতে লজ্জা দেয়া তাহাদের পক্ষে ভালো কথা নয়—মানুষের ধর্ম বিরুদ্ধ এ কাজ।

এ কথা কুবের জানে যে, হোসেন মিয়ার বিচার করিয়া শাস্তি-বিধানের কল্পনা জেলেপাড়ার এই সমবেত মাতব্বরেরা করিবে না। তবু আজ এই সমষ্টি বিচারকের ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। কী স্পষ্টভাবেই না হোসেন মিয়াকে অপমান করিতেছে সকলের বসিবার ভঙ্গি, চাহিবার ভঙ্গি, চুপ করিয়া থাকিবার ভঙ্গি।

বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া এদিক, ওদিক চাহিতে চাহিতে কুবের দেখিতে পাইল, জহর, আমিনুদ্দি এবং আরও দু জন মুসলমান মাঝি অত্যন্ত গম্ভীরমুখে এ দিকে বসিয়া আছে। ধরিতে গেলে এরাই কেতুপুরের মুসলমান মাঝির সমাজ, আরও দু-চার জন যাহারা আছে তাহারা একান্ত নগণ্য। এদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় ঘরের

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বেশি হইবে না। জেলেপাড়ার পূর্ব দিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলোতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক, ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত করিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে তাহা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়। বাড়িতে আনাচে-কানাচে লাউ-কুমড়া ফলিলে, মুরগিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরের আর এমন বৌ-ঝি বাড়িতে যদি কেহ থাকে, যাহার বয়স খুব কাঁচা-তাহার। এরা এবং জেলেপাড়ার অমুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে বড় অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য! বিবাদ যদি কখনও বাঁধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের-আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।

মধ্যস্থ হয়তো করে জহর মাঝিই।

বলে, 'কুবের বাই ছাড়ান দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি, সামাল দে। পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই?'

কুবের লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইল, এই আমিনুদ্দি আজ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে চাহিয়া নাই, সে চাহিয়া দেখিতেছে আমিনুদ্দিকে। আমিনুদ্দির অস্বস্তিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেক বার বিবাদ মিটিলেও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবেরের রাগ ছিল। চোখে চোখে মিলিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কেহ কথা কহে না। কী ভাবিয়া হোসেন মিয়া হঠাৎ কুবেরকেই বিলম্বিত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিল ঃ

'পিছে বইলা ক্যান কুবের বাই? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই?'

কুবের হঠাৎ বড় উল্লাস বোধ করিল। আগাইয়া সকলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, 'খাইছি মিয়া বাই।'

বাঁ হাতে নিজের লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া হোসেন মিয়া বলিল, 'গণেশেরে দেহি না? গেছে কই?'

'কেডা জানে? ফিরতি বেলায় মেলার মদ্যি মাইজা কর্তা ডাইকা কয়, গাঁয়ে ফেরস নাকি গণেশ? মাছগুলা বাড়িতে দিয়া আসিস, লইয়া যা। কইয়া এক ডালা ইলসা মাছ দিলেন। মাছ দিবার লাইগা গণশা কর্তাগো বাড়িতে গেছে সন্দ করি।'

মেজ কর্তার নাম অনন্ত তালুকদার। কেতুপুর গ্রামখানি তাহারই। জেলেপাড়ায় যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজ কর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে। মেজ কর্তার নামোল্লেখে সকলে মন দিয়া কুবেরের কথা শুনিল। হোসেন মিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কর্তা আলেন কবে?'

'আলেন আর বিষ্যুদবারে।'

হীরু মাঝি চোখ মিটমিট করিতে করিতে বলিল, 'মাইজা কর্তার সকল সংবাদ দেহি রাখস কুবের, ভুবন সার লগে মামলার কী হইল ক দেহি?'

কুবের বলিল, 'কর্তা হাঁসচরের দখল পাইছেন। ভুবন সার নায়েব নাকি কয়েদ হইছে শুনি জ্যাঠা। সাঁইথির কুঞ্জ গোঁসাই সাক্ষী দিছে; স্যায় নাকি নিজের চোখে নায়েবের কর্তাগো কাছারি ঘরে আগুন দিতি দেখিছে।'

পীতম বলিল, 'হ? তুই জানলি কিবা?'

কুবের সগর্বে বলিল, 'ইডা কী জিগাও মামা? আমার জাননের বাকি কী? শেতল বাবুর ঠাঁই জানলাম।'

শীতলের নামোল্লেখে পীতম মাঝি নিঝুম হইয়া গেল। নকুল শয়তানি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'শেতল বাবু? তেনারে পালি কই কুবের?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কুবের হাসিয়া বলিল, 'নকুলদা য্যান পোলাপান, জান না কিছু। শেতল বাবু ঠাঁই পয়সা পামু, কাল হইতে আমাগোর যুগীর বাড়িতে তাগিদ দিবার গেছিলাম। পয়সা দিবার মতলব ডাকাইতটার নাই, খাতির কইরা কইল, বয় রে কুবের, তামুক খা। তামুক টানি রাইজ্যের গল্প কইরা আইলাম। কইলি না পিত্যয় যাবা নকুলদা, শেতল বাবু কয়, মাইজা বাবু দেনায় ডুবছে।'

হোসেন মিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

'বিয়ানে এক বার বাড়িতে যাইও রাসু বাই। পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপের জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই-খাওন-পরন বাদ। কাইল যাইও। লালচে দাঁড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদু হাসে, বলে, মনে করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমাদের ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার পয়সা কিসির? কোনো হালারে আমি জবরদস্ত ময়নাদ্বীপি নিছি? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না? একসাথে আইতাম?'

রাসু ঘাড় নিচু করিয়া থাকে। আমিনুদ্দি বলে, 'যান নাকি মিয়া?'

'হ।'

'শোনেন। আমি ময়নাদ্বীপি যামু না কইয়া থুইলাম।'

হোসেন মিয়া তেমনি মৃদু মৃদু হাসে।

'তোমারে যাতি কই নাই আমিনুদ্দি। খুশি না হলি ক্যান যাবা?'

পাতলা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজিয়া যাওয়ায় হোসেন মিয়া বুকের নিবিড় লোমরাজি দেখা যাইতেছিল সেইখানেই হাত দিয়া সে। আবার বলিল, 'জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, অ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি।—কুবের বাই, ঘর যাইবা নাকি?'

কুবের সায় দিয়া উঠিয়া আসিল। দু জনে গোয়াল পার হইয়া নামিয়া গেল পথে। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জেলেপাড়ার পথ পায়ের তলেও হইয়া আছে অদৃশ্য। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইতে হয়, দীর্ঘ কালের পরিচয় না থাকিলে বাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়া আঁকাবাঁকা পথ তাহারা খুঁজিয়া

পাইত না। কুবেরের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আকাশের জমানো মেঘ হঠাৎ গলিয়া যাওয়ায় চোখের পলকে তাহারা ভিজিয়া উঠিল। কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়াও উঠিল গিয়া তাহার ভাঙা কুটিরে।

দাওয়ায় ছাট আসিতেছিল, হোসেন মিয়াকে ঘরের মধ্যেই বসিতে দিতে হইল। কুবেরের দুই ছেলে লখা ও চণ্ডী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া ছিল গোপী। চাটাইয়ের উপর জাঁকিয়া বসিয়া হোসেন মিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল, বলিল, 'পিয়াস জানায় বিবিজান, পানি দিবা না?' গোপী ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল, আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটা গোপী করিয়া লইল শুদ্ধ।

হোসেন মিয়া রাত্রে কুবেরের বাড়িতে থাকে, বৃষ্টি ধরিবার লক্ষণ দেখা যায় না। পিসী ঢেঁকি ঘরে গিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে, ভাইদের পাশে শুইয়া গোপীর দু চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে, শ্রান্ত কুবেরের চোয়াল ভাঙিয়া হাই উঠে, বাহিরে চলিতে থাকে অবিরাম বর্ষণ। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর ঘরের ফুটা কোণ দিয়া ভিতরে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া হোসেন মিয়া আপনা হইতে কাল সকালেই কুবেরের ঘর ছাইবার ছন দিবার কথা বলিয়াছে। কুবের এক সময় উঠিয়া গিয়া মালার অবস্থা দেখিয়া আসে। বহু যত্নে কুবের তাহার আঁতুড়ের চারিদিকে বেড়ার সমস্ত ফুটা বন্ধ করিয়াছে, দাওয়ার এ দিকটা ভাসিয়া গেলেও আঁতুড়ে বৃষ্টি ছাট ঢুকিবার কোনো পথ নাই। মেঝেটাই শুধু হইয়া আছে ভিজা স্যাঁতসেতে যার কোনো প্রতিকার করার সাধ্য কুবেরের নাই। আর কটা দিন পরেই মালা এখান হইতে মুক্তি পাইবে। বুকে পিঠে তাহার যে অল্প ব্যথা হইয়াছে, ক দিন এখানে থাকার ফলে সেটা বাড়িয়া না গেলেই বাঁচা যায়।

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমারে দুগা-চিড়া দিবা গো?'

'ক্যান, ভাত খাস নাই?'

'খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'জ্বালাইয়া মারস বাপু তুই।' বলিয়া কুবের কলসি খুঁজিয়া পিসীর নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়। উঠিয়া বসিয়া অন্ধকারে চিড়া মুখে দিয়া মালা বলে, 'হোসেন মিয়াকে খাইতে দিবা না?'

'কী দিমু?'

'মেলার থেইকা আম না আনছিলা? তাই দাও—করবা কী? খিদায় মানুষটা খুন হইয়া না যায়!'

কুবেরের সহসা মনে পড়িয়া যায়। ভাবে, সিধুর কাছ হইতে যে মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাই দিয়া আতিথ্য করিলে মন্দ হয় না। মুসলমান মানুষ মাংস বেশ পছন্দ করিবে। কিন্তু পর ক্ষণেই এ বিষয়ে কুবেরের উৎসাহ কমিয়া যায়। এমন এক দিন ছিল হোসেন মিয়া যখন খাসির মাথার ব্যঞ্জন পাইলে ধন্য হইয়া যাইত, আজ যাহার-তাহার রান্না ওসব কি আর সে খাইবে? শুধু না-খাওয়া নয়, খাইতে বলিলে হয়তো সে আজ অপমানই বোধ করিয়া বসিবে। তাহার চেয়ে আম যখন আছে, তাহাই দেয়া ভাল।

ঘরে গিয়া কুবের একটু অবাক হয়। চাটাই-এ চিত হইয়া শুইয়া ইতিমধ্যেই হোসেন মিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুবের সন্তর্পণে মৃদুস্বরে এক বার বলে, 'মিয়া বাই।' সাড়া না পাইয়া ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙায় গোপীর।

'সিধুর ঠাঁই ব্যানুন আনছিলি গোপী?'

ঘুমে আধমরা গোপী বলে, 'উহুঁ।'

'উহুঁ! আনতি কইয়া গেলাম না হারামজাদী?'

বহুমূলে কুবেরের জোর টিপুনিতে গোপী চমকিয়া সজাগ হইয়া বসে। বলে, 'আনতি গেছিলাম বাবা। দিল না। কইল, বিড়ালে সব খাইয়া গেছে গা।'

'বিড়াল খাইয়া গেছে কইল, না?'

গোপী সায় দিল। কুবের রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'হালা জুয়াচোর। র, বিয়ানে খাওয়ামুনে বিড়ালরে। হালা বজ্জাইত!'

ছাড়া পাইবা মাত্র গোপী ঢলিয়া পড়ে। ঘুম বোধ হয় আসে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরের যে কোণে জল পড়িতেছিল কুবের

সেখানটা পরীক্ষা করিয়া দেখে। জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য সেখানে সে একটি সরু নালী করিয়া দিয়াছিল, মাটি গলিয়া তাহা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। জল জমিয়া ঘরের ভিতরের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে অনেক দূর। হাত দিয়াই নালাটা সাফ করিয়া দেয়। তারপর এক গভীর সমস্যার কথা ভাবিতে থাকে। ডিবরিতে বেশি তেল নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভিয়া যাইবে। হোসেন মিয়াকে ডাকিয়া তুলিয়া আম খাওয়ার অনুরোধ এখন সে জানাইবে কি? বাদলা নামিয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। লোকটা আরামে গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। ডাকিলে চটিবে না তো?

ঘুমের মধ্যে হোসেন মিয়া পাশ ফিরিল। হঠাৎ কুবের কী আবিষ্কার করিয়াছে। হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে আনকোরা নতুন একটা টাকা-পয়সা রাখিবার ব্যাগ! ব্যাগটা যে আজই মেলায় কিনিয়াছে সন্দেহ নাই। শখ করিয়া নতুন ব্যাগে কত টাকা-পয়সা হোসেন মিয়া রাখিয়াছে কে জানে, ব্যাগটা ফুলিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে।

কুবেরের দেহে কাঁপুনি ধরিয়া যায় এক মুঠো টাকা ও রেজকি হইতে প্রথমে একটি আধুলি ছাড়া আর কিছু লইতে সাহস পায় না। তার পর সে ভাবিয়া দেখে যে, এতগুলি খুচরা রেজকি কি আর হোসেন মিয়া হিসাব করিয়া গুনিয়া-গাঁথিয়া রাখিয়াছে? আরও কটা সিকি এবং একটা আনি সে বাহির করিয়া লয়।

ব্যাগটা হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকাইয়া ফু দিয়া সে ডিবরিটা নিবাইয়া দেয়। তখন একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া যায়।

গোপী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে, 'বাবা!'

কুবেরের দেহ শিরশির করে, মেরুদণ্ডটার ঠিক মাঝামাঝি।

'চুপ বা গোপী, ঘুম যা।'

'আমারে কাইল পয়সা দিবা?'

'দিমু—চুপ যা, ঘুম যা গোপী।'

গোপী আর কথা বলে না অন্ধকারে দু হাত—লম্বা ছোট চাটাইটি সন্তর্পণে বিছাইয়া কুবর শুইয়া পড়ে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩

ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল হোসেনের। কুবেরকে সেই ডাকিয়া তুলিল, চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যে হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মণ ভরিয়া গেল। কী হইয়াছে? বিপদ কিসের? হ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। এক দফা চোখ মিটমিট করিয়া কুবের আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল, 'যান নাকি মিয়া বাই? খিদায় কাতর হইছেন, সন্দ করি-রাইতে কিছু খান ত নাই। এক কাম করেন দুইগোটা আম খাইয়া যান।'

প্রতুষে ঘুমভাঙা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

'খাওনের কথা থোও কুবির বাই। বাড়িতে গিয় খামু।'

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। গোপীর দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাইয়ার বয়স কত, কুবির বাই?'

'নয় সন্দ কইরা থুইছি।'

'বিয়া দিবা না মাইয়ার?'

'হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু।'

পকেট হইতে হোসেন ব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল। দেখিয়া পাংশু হইয়া গেল কুবেরের মুখ। কিন্তু না, টাকা-পয়সা গুনিয়া দেখিবার জন্য হোসেন ব্যাগ বাহির করে নাই। একটি সিকি বাছিয়া লইয়া সে কুবিরের হাতে দিল, 'বাচ্চাগো খাবার কিনা দিও কুবির বাই।' বলিয়া ব্যাগটা আবার পকেটে রাখিয়া দিল। কুবের আত্মসম্মরণ করিল তৎক্ষণাৎ। যে বিপদ ঘটিল না তাহার জন্য আর কেন বুক কাঁপিবে, মুখ শুকনো দেখাইবে? খুশিতে বেসামাল হইয়া সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, 'ব্যাগটা নতুন দেখি? মেলায় কিনছেন বুঝি কাইল?'

হোসেন বলিল, 'হ।'

কথা কহিতে কহিতে দু'জনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন বৃষ্টি নাই, কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে।

হোসেন এক বার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দানা এই পৃথিবী! ভিজিয়া চুপসিয়া চারি দিকে সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তাহার মধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্য গীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে-মাঠে, ঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া ভণিতায় হোসেনের নাম দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি। হোসেন বুঝি কুবেরকে একেবারে ভুলিয়া যায়। অনেক দিন আগে কুবেরের মতো ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আধ পেটা খাইয়া জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। ফুটা চালার নিচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনিভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

'কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার?

'আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধা দেয়।"

'আমি বাইন্ধবার পারি।'

'কন কী মিয়া বাই?'

হোসেন এখন লাজুক। সে এদিক-ওদিক তাকায়। ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া কুবেরের কাছেই অপরাধীর মতো হাসে। লোকটার আদি অন্ত পাওয়া ভার।

তার পর হোসেন বলে, 'বাঁধুম, শুনবা?'

কুবের বলে, 'কন মিয়া বাই, কন।'

একটু চুপ করিয়া হোসেন সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করেঃ

আধাঁর রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি।
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও,
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির-
মাঝি কত ঘুমাইবা।

কুবের অভিভূত হইয়া বলিল, 'মুখে মুখে বানাইলেন মিয়া বাই?'

'খুশ হলি না পারি কী?' হোসেন মিয়া আর দাঁড়াইল না। দুপর বেলা ঘরের চালের জন্য ছন আনিতে গিয়া কুবের শুনিল, সে বিদেশে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হোসেন মিয়ার কথা কখনো বেঠিক হয় না। কুবেরের জন্য ছন সে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপীর বয়স এগার, কুবের মেয়ের এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে-নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগার বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তাহার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে কখনো পাড়ে নাই, আলাপ-আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহু ক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দু কুড়ি তিন কুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলিয়া টাকার বিষয়ে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইছে, তাই ইলিশ মাছের মরসুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া

কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কি! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।

মানুষ মন্দ নয় যুগল। এত কাল অবস্থা খারাপ ছিল, তাই বত্রিশ বছর বয়স অবধি বিবাহ করিতে পারে নাই। নিজের চেষ্টায় এখন সে অবস্থা ভাল করিয়াছে। উন্নতির জন্য তাহার প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথা কাহারো অবিদিত নয়। দুটি একটি করিয়া কতকাল ধরিয়া কত কষ্টে সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, তাহার পর পণেশের কাছে বোনের বিবাহ দিয়া পাইয়াছিল তেইশ টাকা। সকলে ভাবিয়াছিল, এবার যুগল বিবাহ করিবে, বিবাহের জন্য ছাড়া অত কষ্টে টাকা জমায় কে? কিন্তু যুগল তাহা করে নাই। সমস্ত জমানো টাকা দিয়া একটা বড় নৌকা কিনিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। দুশো টাকা সে নৌকার দাম, সুতরাং টাকা সে কম জমায় নাই। ইচ্ছা করিলে ঐ টাকায় সে তিন-তিনটা বিবাহ করিতে পারিত। অন্তত একটা বিবাহ করিয়া বাকি টাকায় একটা ছোটখাট নৌকা কিনিতে কোনো বাধাই ছিল না। তাহার বদলে উপার্জনের এই স্থায়ী উপায়ের জন্য সমস্ত পুঁজি ভাঙিয়া সে যে সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল তাহার তারিফ করিতেই হয়। দেখো, এক বছরে যুগলের ভাঙা ঘর নূতন হইয়াছে, শীর্ণ দেহে মাংস লাগিয়েছে, বিবাহের জন্য টাকাও সে আবার জমাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে কিনা কে জানে! জাহাজ ঘাটে অত বড় নৌকার না চাহিতে ভাড়া হয়। রেলে ও জাহাজ ঘাটে আসিয়া কত মানুষ ও কত মাল কত গ্রামে যায়, এক একটি বাণিজ্য-দ্রব্যের মরসুমের সময় কত মহাজন গ্রামে গ্রামে দাদন-নেওয়া মাল সংগ্রহের জন্য চড়া দরে অসংখ্য নৌকা ভাড়া নেয়। আর শুধু ভাড়া তো নয়। উপরি আয়ও কি কম! ধানের বোঝাই লইয়া এক দিনের পথ পাড়ি দিবার সময় দশ-বিশ সের ধান নৌকার গোপন ফাঁকে-ফোকরে লুকাইয়া ফেলিবার সুযোগ মেলে ঢের। কেবল ধান নয়, কলাই, মটর, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি কত কী জিনিস বছর ভরিয়া যুগল অমন কত আনিয়াছে। উন্নতি সে আরও করিবে। কারণ, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তাহার এতটুকু শিথিলতা আসে নাই। এখনো সে আগের মতই কৃপণ। আকুরটাকুরের মাঝি

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সমাজে আজ সে একজন মাতব্বর লোক। একদিন সে-ই সে গ্রামের মোড়ল হইয়া দাঁড়াইবে কেহ তাহাতে সন্দেহ করে না।

মালার ইচ্ছা বিবাহটা তাড়াতাড়ি চুকিয়া যায় গোপীর। এত বয়স হইল আর কতকাল বয়স ভাঁড়াইয়া মেয়েকে কুবের ঘরে রাখিবে? লোকে যে ইতিমধ্যেই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বামীকে মালা তাগিদ দিয়া বলে, 'অগো, যুগাইলা নি কিছু কয়?' কুবের তাহাকে চোখ ঠারিয়া বলে, 'কয় না!'

'কী কয়?'

'তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক।'

মালা রাগে বৈকি।

'গাও-জ্বালাইনা কথা দেহি খইর-পারা ফোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে?'

'গোসা হইলে মারুম গোপীর-মা।'

'মারবা নাকি? আগো মার, মার-না যদি মার লখার মাথা খাইবা।'

কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বৌটিকে তাহার রাজরানীর মতো দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরানী দেখিতে কেমন? ছেলেটাও যেন ফরসাই হইয়াছে মনে হয়, এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেন তামাটে লাল রঙের ছিল সে রকম নয়। আঁতুড়ে যত দিন ছিল কুবের বিশ্বাস করে নাই, এখন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়াছে যে ছেলেটা সত্য সত্যই খুব ফরসা হইবে। মালার রং কালো নয়, তামাটে- মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফরসাই দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ায় কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরর ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না। কিন্তু মালার চেয়েও ছেলেটার রং যে ঢের বেশি ফরসা হইয়াছে। আরও কিছু বড় হইলে বিবর্ণ হইয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত রং হয়তো ওর মালার মতোই দাঁড়াইবে। তাহাই যেন দাঁড়ায়।

এখন শ্রাবণের এই প্রথম সপ্তাহে আকাশে মেঘের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। পরপর কয় রাত্রি অবিরাম জলে ভিজিয়া কুবের আবার জ্বর বোধ করিতেছে।

অনেক ক্ষণ নীরবে কাটিয়া গিয়াছে, তবু থামিয়া যাওয়া আলোচনাটা আবার আরম্ভ করিতে কোন রকম ভূমিকার দরকার হয় না। এই মাত্র রাগারাগি হইয়া গিয়াছে। কে বলিল? কত শান্ত ও মোলায়েম কুবেরের গলার স্বর।

'স্পষ্ট কইয়া যুগল কিছু কয় না গোপীর-মা।'

মালার গলাতেও এতটুকু ঝাঁজ নাই।

'কয় না? ক্যান? গোপীরে নিব না।'

'গণশা কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় না। উদ্দিন আমারে জিগায় খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।'

'তুমি কি কইলা?'

'আমি কইলাম, তুই বলদ যুগইলা, খোঁড়া নি ব্যারাম যে মার থাকলি মাইয়া পাইব? আমাগোর গোপীর চলন পরীর পারা। জান কি গোপীর মা, গণশা মোরে এক বিষম বিত্তান্ত কয়। নকুইলা গিয়া গিয়া যুগইলার নাকি মন ভাঙে, বাকা-বাকা মাইয়ার খবর দিয়া আহে। যুগইলা য্যান দুই দশটা মাইয়ার খবর না নিয়া পোপীরে নিব না সন্দ করি, গোপীর-মা।

বলিয়া কুবের যেন ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু মালা তাহাকে চেনে। সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

'জান' নি গোপীর মা আরেক বিত্তান্ত? রাসু গোপীরে নিব কয়।'

মালা বিস্মিত হয় না। শুধু বলে, 'চালচুলা নাই।'

সায় দিয়া কুবের বোধ হয় এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়ে। কারণ অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও মালা আর তাহার কোনো মন্তব্য শুনিতে পায় না। বসিয়া বসিয়া ছেলেকে সে স্তন্য দেয়। রোয়াকের ও দিকে রান্নার জায়গায় বসিয়া পিসী গোপীর মাথার উকুন বাছিতেছে, সারা রাত উকুনের কামড়ে মেয়েটা মাথা চুলকাইয়া সারা হয়। লখা ও চণ্ডী, হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও বঁড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটি মাছ। যেখাইনে ওরা থাক আর যাহাই

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোন দিন না খুন হইয়া আসে। পঙ্গু বলিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম। কেতুপুরের দশ মাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামে গ্রামের এমনি এক কুটিরে তাহার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি করা পাপের প্রমাণস্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড় হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে, লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়াল ঘরের কাছে কদম গাছটি পর্যন্ত ছিল তার কষ্টকর গতিবিধির সীমা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঐ কদম গাছটির তলে খেলা করিত আর করিত মারামারি। বড় ছেলেরা ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মারিয়া আর কিছু রাখিত না। অনেক সময় এই সব মারামারির শেষ ফলটা গড়াইত বয়স্কদের মধ্যে, পাড়ায় মহামারী কাণ্ড বাঁধিয়া যাইত। দূরে দাঁড়াইয়া চোখ বড় বড় করিয়া মালা মজা দেখিত, বড় ভয় করিত তাহার। অন্য ছেলে মার খাইলে সে কিছুই করিত না, কিন্তু যে দিন সকলে মিলিয়া তাহার ছোট ভাই দুটিকে পিটাইতে আরম্ভ করিত সে দিন খুলিত মুখ, তাহার বাঁশির মতো সরু গলা শোনা যাইত পাড়ার সর্বত্র, সকলে ছুটিয়া আসিত। তাহার আগেই মালাকে কিন্তু দিতে হইত ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য। ভাইয়ের বদলে ছেঁচা খাইত সে। এক জন একটা ধাক্কা দিলেই সে মাটিতে পড়িয়া যাইত। তখন চার-পাঁচজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিত রাম গোয়ালার গোয়াল ঘরের পিছনে গোবর-গাদায়।

সেই হইতে ছেলেদের মারামারিকে বড় ভয় করে মালা। নিজের ছেলে দুইটিকে সে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চায় কিন্তু খাতির তাহাকে কেহ করে না। বসিয়া বসিয়া যাহার দিন কাটে কে তাহার মুখ চাহিবে, কথা শুনিবে? হাজার বারণ করুক মালা, লখা ও চণ্ডী চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়। ফাঁকি দিয়া কাছে ডাকিয়া জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে গেলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া একেবারে রক্তপাত করিয়া ছাড়ে। তবু প্রতিদিন মালা তাহাদের নানা ছলে কাছে রাখিবার চেষ্টার কামাই দেয় না। সন্তান-স্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে। ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা

করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি না। চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি না। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাহাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড় একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের যে সংকীর্ণ সংসার, তাহারও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনাবেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাহাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তানপ্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মতো মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য আহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মরাকান্না কাঁদে। মালা পঙ্গু, অলস। ঘরের কোনায় সে স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করে, জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাহাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালোবাসিবার মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।

ছেলেদের সে ফিরিয়া পায় সন্ধ্যার পর। সারা দিন পাখির ছানার মতো অবসন্ন ছেলে দুটি ফিরিয়া আসে ঘরের কোনায়, খোঁড়া মাকে তখন তাহাদের প্রয়োজন হয়। জেলেপাড়ার প্রত্যেকটি কুটিরে যে অভিনয় অজানা, প্রতি দিনান্তে কুবেরের ঘরে তাহার অভিনয় হয়। বাহিরে সবটুকু শয়তানি অপচয় করিয়া লখা ও চণ্ডী শান্ত হইয়া থাকে, ভদ্র ও বাধ্য ছেলের মত ঘেঁষিয়া আসে মায়ের কাছে। সারাদিন মালার যে এক তারফা অবহেলিত স্নেহ খাপছাড়া লাগিতেছিল অপর পক্ষ গ্রহণ করামাত্র তাহা মধুর ও অপুর্ব হইয়া উঠে। মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন,

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বে ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চালে পচা ছনের, চারি পাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের স্যাঁতসেতে ঢেউ তোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।

ইলিশের মরসুমে কুবের এ সময় বাড়ি থাকে কদাচিৎ। যে দিন থাকে সে দিন বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মতো উদাস চোখে এ সব সে চাহিয়া দেখে, স্নেহ-মমতার এই সব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুকুরের মতোই চাটাই-এ একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর। লখা ও চণ্ডীদের মতো সেও মন দিয়া যে রূপকথা শুনিতেছে মালার তাহা টের পাইতো বাকি থাকে না। ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে তাই থামে না, হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া রস দিয়া ঘুমন্ত ছেলেদের গল্প বলিতে থাকে। গল্প বলিতে সে ওস্তাদ। একই গল্প বার বার বলিয়া শ্রোতাদের সে সমান মুগ্ধ করিতে পারে। গোপী সরিতে সরিতে মার গা ঘেঁষিয়া আসে। পিসী ঠায় বসিয়া থাকে দুয়ারের কাছে। মালার গল্প শুনিতে আরও কে কে আসিয়া পড়িয়াছে দেখো। গণেশের বৌ উলুপী, ছেলে মনাই আর মেয়ে কুকী। আর আসিয়াছে সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী। কথা বলিয়া কেহ মালার রূপকথা বলায় বাধা দেয় না। চুপচাপ শুনিয়া যায়। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মালাই সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

'অ লো উলুপী, পাক করছিলি কী?'

'আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম। আর ইলশার ঝোল।'

'কুকী। গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদী। মাইয়া য্যান্ সঙ?'

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া আবার রূপকথা বলিতে থাকে।

৪

এ বার বর্ষায় আউশ ধানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পীতম মাঝির বাড়ির পিছনে তেঁতুল গাছটার গুঁড়ি পর্যন্ত কোনো বার জল আসে না, এবার আউশ ধান পাকিবার সময় হঠাৎ এত জল বাড়িয়া গেল যে গাছের গুঁড়িটা সপ্তাহকাল ডুবিয়া রহিল প্রায় তিন হাত জলের নিচে। এ জল আগে বাড়িলে ক্ষতি ছিল না, জলের সঙ্গে ধানের গাছও বাড়িয়া চলিত। কিন্তু ফসল পাকিবার সময় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ধানগাছ কেমন করিয়া বাড়িবে?

বড় বর্ষা হইয়াছিল এবার। কেতুপুরের মাইল পাঁচেক দূরে চন্নার চর নামে পদ্মার একটা নিচু চর অনেক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, অনেকে ভয় পাইয়া চলিয়া গিয়াছিল চর ছাড়িয়া। বহুকাল আগে খেয়ালী পদ্মা যে ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল কে জানে সে আবার তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে কি না? ডাঙার গ্রামে বর্ষার জল ঘরে উঠিলেও পূর্ব-বঙ্গের লোক ভয় পায় না, সে জলের স্রোত নাই। কিন্তু পদ্মার বুকে ছোট খাট চরে যে সব গ্রাম, পদ্মার জল নাগাল পাইলে সে সব গ্রামের ঘরবাড়ি, গরু, মানুষ কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

কত গ্রাম যে এবার পাঁচ-সাত দিন জলের নিচে ডুবিয়া ছিল।

মালার বাপের বাড়ির গ্রাম চরডাঙা নাকি তলাইয়া গিয়াছিল এক- কোমর জলের নিচে।

খবর পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, ‘আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ। আমার বাপ-ভাই ডুইবা মরে, এক বার নি খবর নিলা।’

গণেশকে সঙ্গে করিয়া কুবের একদিন খবর আনিতে গেল।

খাল পুকুর মাঠ ঘাট তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। দু মাস আগে যে ক্ষেত্রে আল দিয়া মানুষ চলাচল করিত, এখন সেখানে লগি থই পায় না। কোনো গ্রাম ভাসিয়া আছে দ্বীপের মতো, কোনো গ্রামে মানুষের ঘরের ভিতরে এক হাঁটু জল উঠিয়াছে, সকলে বাস

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করিতেছে মাচা বাঁধিয়া। যে পারিয়াছে গরু-বাছুরের জন্যেও মাচা বাঁধিয়া দিয়েছে, যে পারে নাই তাহার বোবা অসহায় পশুগুলি ঠায় দাঁড়াইয়া আছে জলের মধ্যে। গাছের ডালে পাখিরা আছে শুধু সুখে, ভূচর মানুষ ও পশুর কষ্ট অবর্ণনীয়। এক বাড়িতে কান্না শুনিয়া কুবের উঠানে নৌকা লইয়া গেল, দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া ঘরে চাহিয়া দেখিল বাঁশের খুঁটির উপর দুখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া জিনিসপত্রসহ গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেছে, মাস খানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া গৃহস্থের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। কী হইয়াছে শিশুটির? নিচে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কাল রাত্রে। কতটুকু জল মেঝেতে, এক হাতও হইবে না। ছেলেকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জননী ঘুমাইয়াছিল, কখন কেমন করিয়া সে নিচে পড়িয়া গিয়াছিল কে জানে! এক মাসের শিশু নিজে তো নড়িতে-চড়িতে পারে না, সেই ভরসায় তক্তপোষের মাচার চারি দিকে বেড়া তাহারা দেয় নাই, দু দিকে স্বামী-স্ত্রী শুইয়াছিল, মাঝখানে ছিল শিশু। ছেলেকে বুকে করিয়া ঘুমের ঘোরে জননী কি পাশ ফিরিয়াছিল? ঘুমের ঘোরে ধারে সরিয়া সে-ই কি সন্তানকে বিসর্জন দিয়াছিল সর্বনাশা বন্যার জলে?

চরডাঙা পৌঁছিয়া দেখা গেল সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন, কোথাও এক হাত একটু শুকনো জমি নাই। ঘরে ঘরে স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলরাশি থই থই করিতেছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়িতে সকলে আশ্রয় লইয়াছে বড় ঘরের চালার তলে কাঠের ছোট স্থায়ী মাচাটুকুতে।

দুটি গরু ও বাছুরের জন্য তিনটি সুপারিগাছের মধ্যে মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাচা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ির পোষা কুকুরটিও স্থান পাইয়াছে সেখানে। মালার বুড়া বাপ বৈকুণ্ঠ মাচায় বসিয়া ভীত গরু দুটিকে খড় দিতেছিল, ঘরের চালে বসিয়া বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল মালার বড় ভাই অধর, আর ঘরের ভিতরকার মাচায় উঠিবার মই হইতে এ দিকে রান্নাঘরের চাল পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি বাঁশ বাঁধিয়া ইহারা যে সাঁকো তৈয়ারি করিয়াছে তাহার উপরের পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। কুবের আসিয়াছে শুনিয়া মালার ছোট বোন কপিলা মই ধরিয়া নামিয়া আসিল। কুবেরের শাশুড়ি আর নামিল না, ঘরে মাচার উপর হইতেই

কন্যা ও নাতিনাতনীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ষার দেবতাকে শাপান্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে এতখানি বয়স তাহার হইয়াছে, এমন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড আর তো সে দেখে নাই বাপের জন্মে। কুবের কি জানে কী সর্বনাশ তাহাদের হইয়া গিয়াছে, বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া পাট পচাইতে দিয়াছিল, অর্ধেক পাট যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে পাত্তা নাই। ভাসিয়া আর যাইবে কোথায়, কেউ চুরি করিয়াছে নিশ্চয়। হ গরিব গৃহস্থ তাহারা, কত আশায় এবার ধানের জমিতে পর্যন্ত পাটের চাষ দিয়াছিল, কে তাহাদের এমন সর্বনাশ করিয়াছে গো?

মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল। কুবের তামাক সাজিয়া দিল বৈকুণ্ঠকে।

কপিলা বলিল, 'নাও নিয়া আইলা মাঝি, বইনেরে আনলা না ক্যান। কত কাল দেখি নাই বইনেরে! পোলাপানগো তো আইনবার পারতা?'

কুবের বলিল, 'আনুম ভাবছিলাম। তোমরা এখানে কি বা রইছ না জাইনা শ্যাষম্যাষ ডরাইলাম। আসনের লাইগা পোপী কাইন্দা সারা হইয়াছিল। তুমি আইলা কবে কপিলা?'

কপিলা মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'আমার কথা থোও।' সহসা স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তি দেখিয়া কুবের একটু অবাক হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে চাহিল। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ চোখ মটকাইয়া তাহাকে কী যেন ইশারা করিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুবের করিল কি, মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, 'অ!'

কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, 'হাসলা যে মাঝি?'

কুবের বলিল, 'হাসি নাই কপিলা, হাসুম ক্যান!'

কুবেরের বিবাহের সময় বড় দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তাহার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তার পর কপিলার বিবাহ হইয়াছে একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হইয়াছে তাহার মন? আর কি কোনো দিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুঁড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা পলাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনো হয়তো সে কুবেরকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না। না মারুক! একজন চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না বলিয়া আপসোস করার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। হ, সেই পুরানো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া আছে কুবেরের মনে।

জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তাহার বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য কুবের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। এ আহ্বান তুচ্ছ করিবার মতো নয়, কিন্তু সকলে গেলে কেমন করিয়া চলে? বাড়িঘর জিনিসপত্র সব সাময়িকভাবে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলে হইত, সে তো সম্ভব নয়। বোবা গরুবাছুরগুলির কী হইবে। যাইতে পারে ছেলেমেয়েগুলি-আর তাদের দেখাশুনা করিবার জন্য কপিলা যদি যায় তো যাক, মালা তো পারিবে না এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চাকে সামলাইতে।

কপিলা যাইবে? বেশ।

কুবেরের শাশুড়ি বড় চেঁচায়। সে বলিল, 'তোমারে কমু কী মাইয়ারে নিয়া জ্বইলা মরি-হরে বাপ, কপিলার কথা কই-মালার লাইগা ভাবুম কেরে? সোনার জামাই তুমি, খোঁড়া মাইয়ারে আমার মাথায় কইরা থুইছ-এই পোড়াকপাইল্যার কথা কই, কই আমাগো কপিলার কথা! অলক্ষ্মীর মরণ নাই!

সে বড় দুঃখের কাহিনী। সুখে ঘরকন্না করিতেছিল কপিলা, কী যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ি। রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামাদাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।

এ খবর কুবের জানিত না। সে বিস্ময়ে বলিল, 'হ!'

তার পর কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হইয়াছিল-ফাল্গুন মাসে। শ্যামাদাস তাহাকে বাড়িতে উঠিতে দেয় নাই, খেদাইয়া দিয়াছে। মানুষ তো নয়, পশু। তাই তো কুবেরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কপিলার মা দিনরাত্রি তাহাকে গাল দেয়।

তাই বটে, পঙ্গু বলিয়া মালাকে সে কখনো অনাদর করে নাই সত্য। সেটা তবে এতখানি প্রশংসার ব্যাপার? মালার জন্য তাহার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসার-এর ওই অলস অকর্মণ্য রমণীটির জন্য কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে, সৎ গৃহস্থ ও সৎ স্বামী বলিয়া যে প্রশংসা তাহার জননী গলার জোরে দিগদিগন্তে রটনা করে তাহা যেন মালারই কীর্তি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কপিলা ও তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে করিয়া কুবের কেতুপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তাহার বেগুন রঙের শাড়িখানা। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তাহার কাঁচা। আহা, কুটুমবাড়ি যাওয়ার নামে মেয়েটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়াছে।

কেতুপুরে পৌঁছিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। মালা উতলা হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিছু পাট চুরি-যাওয়া ছাড়া তাহার বাপ ভাইয়ের আর কোনো ক্ষতি হয় নাই শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মালা শুধু খোঁড়া হইয়া জন্মে নাই, আরও একটি পঙ্গুতা তাহার আছে; সে হাসিতে জানে না, জীবন তাহাকে অলস করিয়া বিষণ্ন করিয়াছে। ভাইবোনদের কাছে পাইয়া কত কাল পরে যে মুখে তাহার বিষণ্নতার ছায়ালেশহীন হাসি ফুটিল।

এদিকে স্বস্তি নাই কুবেরের। তাহার মতো গরিব কে আছে জগতে? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে, ইহাদের সে খাওয়াইবে কী? আউশের ফসল নষ্ট হইয়া এবারে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এখন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়, জলমগ্না পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরসুম বলিয়া এখন যদি বা কোনো রকমে চলিয়া যায়, তার পর? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল। অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যাইবে, তার পর সপরিবারে উপবাস করিবে সে। তখন হাত পাতিলে বৈকুণ্ঠ একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না।

নিমন্ত্রণ করিয়া ওদের সে তবে আনিয়াছে কেন? তাহার দুঃখের দিনে যাহারা ফিরিয়া তাকায় না, কেন সে তাহাদের অত খাতির করিতে গেল? সে আদর করিয়া ডাকিয়া না আনিলেও বন্যার ক-টা দিন ওরা মাচার উপর বেশ কাটাইয়া দিতে পারিত। মনে মনে কুবের রাগিয়া যায়। মালা খুশি হইয়াছে। হাসি ফুটিয়াছে মালার মুখে? স্বামীর দুঃখ না বুঝিয়া যে স্ত্রীলোক বাপ-ভাইয়ের জন্য কাঁদিয়া মরে, হাসিমুখে তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে হয় আখার তলের ছাই। মালা উতলা না হইলে কে যাইত চরডাঙায়, কে আনিত তাহার ভাইবোনদের ডাকিয়া?

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা কুবের মাছ ধরিতে যাওয়ার আগে, পিসী সকলকে ভাত বাড়িয়া দেয়। কুবের এই মাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতে অনিবার্য ক্ষুধায় তাহার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করে, গোপীর পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয়-এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে। হয়তো তখন গণেশ ও ধনঞ্জয় কেহই আসে নাই-কুবের চুপ করিয়া বসিয়া থাকে একা। নদীর ঢেউয়ে নৌকা দোল খায়। হু হু করিয়া বহে বাতাস, অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতোই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে।

কপিলা যে পিছু পিছু আসিয়াছে তাহা কি কুবের জানে?

তাহার আকস্মিক হাসির শব্দে কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যারাতে কে হাসিবে? মানুষ নয়, নিশ্চয় নয়!

কপিলা বলে, 'তামুক ফেইল্যা আইছ মাঝি।'

কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে।

বলে, 'খাটাসের মতো হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?'

কপিলা বলে, 'ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ।'

তার পর বলে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'

বলে আর কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চির দিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া বলে, 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।'

কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে পুরুষ!'

তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস-সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড় ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, 'পাঁক মাইখা মরস কেনে কপিলা? মাইনষে কইব কী, যা বাড়িত যা।'

কে জানে কী আছে কপিলার মনে? সে চলিয়া গেলে কুবেরের দুটি চোখের ঔৎসুক্য অন্ধকারে গোপন হইয়া থাকে। কপিলার আনিয়া দেওয়া-তামাক সাজিয়া সে টানিতে আরম্ভ করে। তামাকের ভাগীদার না থাকায় আরামটুকুই কি তাহার মানসিক চাঞ্চল্যকে ক্রমে ক্রমে শান্ত করিয়া আনে, অথবা সে নদীর বাতাস- নায়ের দোলনে পদ্মার প্রেম? মালা যে কোনো দিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারি দিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহার জন্য কুবেরের কোনো দিন আপসোস ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালার আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তাহারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে-ভাঙা চালার নিচে সঙ্কীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনো দিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না-বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে।

বেগুনি রঙের শাড়িখানা পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে-

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জীবনে কুবের কখনো সে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তা-ভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবা মাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীনমলিন শয্যা এবং ফাঁক পাইলেই কোনোদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনোদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া-ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।

পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।

কমে মাঠঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বৈ কি। একদিন মালার বড় ভাই অধর খবর লইতে আসে। কুবেরকে সে সত্য-সত্যই কুবের ঠাওরাইয়া রাখিয়াছে কি না সে-ই জানে, কর্জ চাহে দুটি টাকা। না পাইয়া তাহার রাগ হয়। সকলকে চরডাঙায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কুবের বারণ করে না, মালাও নয়, ভাইবোনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ পুরানো হইয়া আসিতে কত দিন আর লাগে বোনের? তাহা ছাড়া কপিলার চাপল্য ও হাস্যপরিহাসের জন্য ঈর্ষাও হয়তো মালার হয়, কোনোদিন হয়তো কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যায় মাখামাখি চোখেও পড়িয়াছে তাহার-এক স্থানে ঠায় বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি তো সে পাতিয়া রাখে সর্বত্র।

কিন্তু কপিলা যায় না। ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়। কে জানে, কী আছে কপিলার মনে!

ময়নাদ্বীপ হইতে রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময় গ্রামের লোকের কাছে পুরানো হইয়া গিয়াছে, রাসুর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিবার কৌতূহল হইয়া গিয়াছে, রাসুর অভিজ্ঞতার গল্প বার বার আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটা বলিবার জন্য সে ছটফট করে, কিন্তু শ্রোতা পায় না। কত শুনিবে লোকে। শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে সকলের।

হোসেন মিয়া কিছু টাকা দিয়াছে রাসুকে, রাসুর ইচ্ছা টাকাটা দিয়া সে একটি বৌ খরিদ করে, গোপী হইলেই ভাল হয়। কিন্তু কুবের এ প্রস্তাব কানেও তোলে না। কত টাকা দিয়াছে হোসেন মিয়া তাহাকে? তাহা ছাড়া গোপীর পাত্র ঠিক হইয়াই আছে-গণেশের শালা যুগল। যুগলের মত পাত্র থাকিতে তাহার হাতে কুবের মেয়ে দিবে কেন?

গোপীকে কিন্তু বড়ই পছন্দ হইয়াছে রাসুর।

ময়নাদ্বীপের গল্প করিবার ছলে সে কুবেরের বাড়ি আসে, আড় চোখে আড় চোখে সারাক্ষণ সে গোপীর দিকে তাকায়, পরীর মতো সুন্দর মনে হয় গোপীকে তাহার। ভাইকে কোলে করিয়া বাঁকা হইয়া কী তাহার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা! হ, রুখো-রুখো লালচে বটে চুলগুলি গোপীর, কপালটা একটু উঁচুই, থ্যাবড়ানো নাকের নিচে উত্তোলিত ওষ্ঠে ঠেকিয়া নোলকটা তাহার দুলিতে পায় না, আর হ বড় নোংরা গোপী। তবু তো রাসু চোখ ফিরাইতে পারে না। তবু তো তাহার মনে পড়ে না, এমন অতুলনীয় রূপ সে কোথাও দেখিয়াছে। কী রঙ গোপীর! কী মনোহর তাহার চলাফেরা, কী চাউনী!

বয়স রাসুর বেশি হয় নাই, যুগলের চেয়েও তাহার বয়স কম। নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া জীবনটা আবার গুছাইয়া লইবার সময় তাহার পার হইয়া যায় নাই। গোপীকে পাইলে আবার সে আরম্ভ করিতে পারে-বয়স্থা বাড়ন্ত মেয়ে গোপী, বিবাহের এক বছরের মধ্যে স্বামীর ঘর করিতে আসিবে, পাঁচ-ছ'বছরের একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার বড় হইবার আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য রাসুর আর নাই। যাহাদের সে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে, ময়নাদ্বীপে, তাড়াতাড়ি আবার তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া চাই। একা একা বড় কষ্ট হইতেছে রাসুর। পীতম মাঝির সঙ্গে রাসুর কলহ হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়ার দেওয়া টাকাটা বাগাইয়া লওয়ার জন্য মাঝি বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসু তাই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কে জানিত গ্রামের মধ্যে পীতমের মেয়ে যুগীই সর্বস্বান্ত পিসতুতো ভাইটিকে এতখানি খাতির করিবে। শীতলকে দিয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বাবুদের বলিয়া ঘরের কাছে খানিকটা জমি যুগীই রাসুকে যোগাড় করিয়া দিয়াছে-রাসু একখানা ঘর তুলিয়াছে সেখানে।

সেই ঘরে রাসু বাস করে একা, হয়তো ধ্যান করে গোপীর। বিকালে কেতুপুর গ্রামের মধ্যে সওদা আনিতে যাওয়ার সময় পথের নির্জনতম অংশে কোনো কোনো দিন গোপী রাসুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়।

রাসু বলে, 'কই যাও গোপী?' সে একটু স্নেহ-ব্যঞ্জক হাসি হাসে। গাঁট হইতে বাহির করে একটি কাঁচ-বসানো পিতলের আংটি আর পুঁতির মালা, বলে, 'নিবা?'

গোপী খুশি হইয়া উপহার গ্রহণ করে। রাসুকে ভালোই লাগে তাহার, রাসুর জন্য সে-ই একটু দুঃখ বোধ করে। কোথায় সে ময়নাদ্বীপ কে জানে, সকলকে রাসু সেখানে হারাইয়া আসিয়াছে, বড় কষ্ট পাইয়াছে সে জীবনে! তাহা ছাড়া রাসুর কথাগুলি ভারি মিষ্টি, শুনিতে বড় ভালো লাগে গোপীর। আর কী খাতিরটা রাসু তাহাকে করে। কত যেন সে বড় হইয়াছে, এগার বছরের মেয়ে সে নয়।

যুগীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রাসু পরামর্শ করে, একটা কি উপায় ঠাওরানো যায় না কুবেরকে যাহাতে রাজি করানো যায়? পরামর্শ অনেক হয়, উপায় হয় না। শীতলের অনুপস্থিতিতে তাহার পরিষ্কার শয্যায় আরাম করিয়া বসিয়া তাহার হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে পরামর্শ করিতে ভালো লাগে রাসুর। আর যুগীর সমবেদনা। রাসুকে যুগী খুব খাতির-যত্ন করে, রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের কাহিনী বার বার শুনিয়াও সে শ্রান্ত হয় না। কত বাসিন্দা ময়নাদ্বীপে? কী কী ফসল হয়? দ্বীপের চারি দিকে বুঝি সমুদ্র? আচ্ছা সমুদ্র কত বড়-পদ্মার চেয়েও বড় বুঝি? আজও যুগী রাসুকে এসব প্রশ্ন করিতে ভালোবাসে। যুগীর বয়স বেশি নয়, বছর বাইশ-বড় শান্ত তাহার মন। শীতল তাহাকে সুখে রাখিয়াছে জেলেপাড়ার দারিদ্র্য ও হীনতা হইতে। যুগীর মনে অপরিমিত সন্তোষ। এত দয়ামায়া, এমন কোমলতা জেলেপাড়ার

আর কোনো মেয়ের নাই। জেলেপাড়ার কারো ঘরে কোনো দিন যদি অন্ন না থাকে, চুপি চুপি এক বার যুগীর কাছে আসিতে পারিলে আর তাহার উপবাসের ভয় থাকে না।

দুঃখের কাহিনী যে যত জমজমাট করিয়া বলিতে পারে ছলছল চোখে যোগী তাহাকে চাল দেয় বেশি-খরচের পয়সা দান করিয়া শীতলের বকুনি শোনে। শীতল লোকটা বড় কৃপণ, যুগীর দান করা স্বভাবটা সে পছন্দ করে না, কিন্তু এমন আশ্চর্য মন মানুষের, যুগীর এই মন্দ স্বভাবের জন্যই তাহাকে শীতল ভালোবাসে বেশি। যুগীকে সে কৃপণ হইতে বলে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিলে যুগী যে দিন ভয়ে ভয়ে তাহাকে না শোনায় যে একজন আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যা পাইয়াছে আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে দিন মনটা যেন খুঁতখুঁত করে শীতলের।

মাছের মূল্য বাবদ কুবের কয়েক আনা পয়সা পাইত। শীতল কখনো ঋণ পরিশোধ করে না। তাগিদ করিয়া করিয়া কুবের হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবু একদিন সকালে সে আশা করিয়া আসিল।

যুগী রাঁধিতেছিল, শীতল আর রাসু করিতেছিল গল্প। কুবেরকে দেখিয়া রাসু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বসিতে দিয়া খাতির করিয়া কলিকাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'তামুক খাও।'

না, কুবেরের বসিবার সময় নাই, তামাক খাওয়ার সময় নাই, শীতল তাড়াতাড়ি পয়সাটা দিয়া দিক, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে- বসিয়া তামাক টানিতে আসিয়াছে না কি সে? হ, কুবের আজ রাগিয়াছে। আজ সে মাছের দাম আদায় করিয়া ছাড়িবে। শীতল প্রথমে অমায়িক হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'এত রাগ কেন কুবের, এই সকালবেলা?' তার পর সেও রাগিয়া যায়, 'যা যা দিম না পয়সা, কর গিয়া নালিশ।'

রাসু বুঝি কুবেরকে খুশি করতে চায়, সে বলিল, 'দেন শেতল বাবু, দিয়া দেন পয়সা।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পয়সা দিল যুগী। কলহের মাঝখানে দশ আনা আনিয়া কুবেরের সামনে রাখিয়া দিল, শীতলকে ধমক দিয়া বলিল, 'সামান্য ক-আনা পয়সার জন্য এত কাণ্ড করা কী জন্য?' কত কর্তৃত্ব যুগীর। শীতল কথাটি বলিল না, কুবেরের দিকে কড়া চোখে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পয়সা কুড়াইয়া কুবের উঠিল, সঙ্গে উঠিল রাসু। কী বিনয় রাসুর, কী সব তোষামোদের কথা। পথ চলিতে চলিতে রাসু নানা কথা বলে। এবার সে একটা ব্যবসা আরম্ভ করিবে-ব্যবসা ছাড়া পয়সা নাই মানুষের, একটা দোকান দিবে সে দেবীগঞ্জে। কিসের দোকান এখনো সে তাহা ঠিক করে নাই, ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা কিছু ঠিক করিয়া লইবে-কুবের কী পরামর্শ দেয়? জীবনে উন্নতি করিবে রাসু, প্রাণপণ করিয়া লাগিলে কী না হয় জগতে? তাছাড়া পুরুষের ভাগ্যের কথা কে জানে! আজ ফকির-কাল রাজা! কুবের গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলে, 'হ'। ভাবে, ময়নাদ্বীপে গিয়া বড় বড় কথা বলিতে শিখিয়া আসিয়াছে রাসু, চাল দিতে শিখিয়াছে! মাঠের দিকে চাহিলে বোঝা যায় জল কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ধানের ফসল কাত হইয়া পড়িয়া আছে। পদ্মা হইতে আজ জোর বাতাস বহিতেছিল, চারি দিকে অসংখ্য পাখির কলরব, শিশিরভেজা ডাঙায় ছড়াইয়া আছে সোনার রোদ। শরৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। নদীতীরে কাশের বন এবার সাদা হইয়া উঠিবে। কুবেরের সঙ্গে রাসু তাহার বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া যায়। না, গোপী এখন বাড়ি নাই। কপিলার সঙ্গে সে জল আনিতে গিয়াছে নদীতে। কুবের রাসুকে বসিতে বলে না, পিসীর নিরিবিলি ঘরখানায় গিয়া ঢোকে ঘুমের জন্য, রাসু আস্তে আস্তে ফিরিয়া যায়। যায় সে নদীর ধারে, গাল সে খায় কপিলার, তার পর হন হন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে কেতুপুর গ্রামের দিকে। না, নদীর ধারে ও ভাবে দাঁড়ানো উচিত হয় নাই। কপিলা যদি বলিয়া দেয় কুবেরকে?

ভাদ্রের পরে আশ্বিন। আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা।

একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারা দিন টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল, নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাতে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড় বড় গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইলিশের মরসুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দু দিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোনো ঘরে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূরদূরান্তে। কেহ ফিরিবে প্রভাতে, কেহ ফিরিবে না। ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে- ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূধনকে ডাকিয়াছে। এ কি রোষ দেবতার? কেন এ প্রলয়?

সকালে ঝড় কমিল কিন্তু একেবারে থামিল না। সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল গুঁড়িগুঁড়ি। জেলেপাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলিকে কে যেন আবর্জনার মতো নাড়িয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। কোনো ঘর কাত হইয়া পড়িয়াছে, কোনো ঘরে চালা নাই, কোনো চালার অর্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া বাঁশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠান ভরিয়া গিয়াছে, গোপী খুব আঘাত পাইয়াছে, কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কি না। চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরের উপর, হীরু আর সিধুর একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া নাই, অনুকূলের তিনখানা ঘরের একটার চালা নাই, বাকি দুইখানার চালায় নাই খড়। রাসুর ঘরখানা ছিল একেবারে ফাঁকায়, ভিটা আর দুটি খুঁটি ছাড়া ঘরের চিহ্নটুকুও দেখিতে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পাওয়া যায় না। শীতলের বাড়ির চারি দিকে বড় বড় গাছ, তাহার একটা গাছ পড়িলে বাড়ি তাহার পিষিয়া যাইত, কিন্তু গাছের আশ্রয়েই ঘরগুলি তাহার বাঁচিয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার আরও অনেকেরই ক্ষতি হইয়াছে অল্পবিস্তর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে ক্ষতি হইয়াছে আমিনুদ্দির বেশি। প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দির বৌ আর ছেলেমেয়ে তিনটি ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বৌ থেতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটার প্রাণ ছিল, ঘণ্টাখানেক পরে সেও শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু মেয়েটার কিছু হয় নাই আমিনুদ্দি কোথায় আছে কে জানে, হয়তো ডাঙ্গায় নয়তো পদ্মার উত্তাল জলতলে, তাহার অত বড় মেয়েটা কারো সান্ত্বনা মানিতেছে না, হাউমাউ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। যে মেয়ের পর্দা রাখিবার জন্য গরিব আমিনুদ্দি কুটির ঘেরিয়া উঁচু বেড়া দিয়াছিল, আজ যার খুশি তাহাকে দেখিয়া যাও। কালো চোখে কাল সে যে কাজল দিয়াছিল এখনো তা ধুইয়া যায় নাই-বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওর কাজল চোখের সলাজ চাহনি দেখিয়া কাল অপরাহ্নে জহরের জোয়ান ছেলে নাসির বুঝি খুশি হইয়া পদ্মায় নৌকা ভাসাইয়াছিল, পদ্মা হয়তো তাহাকে এতক্ষণ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে পৃথিবীর বুক হইতে।

ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে জেলেপাড়ার নরনারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। ঘাটে তিনটি নৌকা বাঁধা ছিল, একটি অদৃশ্য হইয়াছে, দুটি উঠিয়া আসিয়াছে ডাঙায়। খানিক দূরে গাছপালা সমেত খানিকটা ডাঙা ধসিয়া গিয়াছে, আরও খানিকটা অংশ ফাটল ধরিয়া আছে, শীঘ্রই ধসিবে।

পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনো লাভ নাই, চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফাটিয়া গেলেও কাল যারা নদীতে পাড়ি দিয়াছিল তাহাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যে নদীতে ডুবিয়াছে সে তো

গিয়াছেই, ডাঙায় যারা আশ্রয় পাইয়াছে পদ্মা শান্ত না হইলে তাহাদের ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।

ডাঙা-পথে আসিতে পারে।

কিন্তু এখনো মাঠে-ঘাটে জল একেবারে সরিয়া যায় নাই, কে কোথায় ডাঙা পাইয়াছে কে জানে, হয়তো সেখান হইতে ডাঙায় পায়ে হাঁটিয়া আসিবার সুবিধা নাই। গৃহের জন্য মন হয়তো তাহাদের উতলা হইয়াছে, ভোরের আলো ফুটিলে এই উন্মাদিনী নদীর তীর ঘেঁষিয়া নৌকা বহিয়া হয়তো তাহারা গ্রামে ফিরিবার চেষ্টা করিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে বাতাস পড়িয়া গেল। পদ্মা শান্ত হইয়া আসিল। অপরাহ্নে একটি দুটি করিয়া জেলেপাড়ার নৌকাগুলি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে যারা আসিয়া পড়িল, সকলে তাহাদের ঘিরিয়া জুড়িয়া দিল কলরব। '-বাকি সব? অন্য সকলের খবর কী?'

সকলের খবর তাহারা দিতে পারিল না, কে কোথায় তীরে ভিড়িয়াছে কে জানে, দু-চার জনের খবর মাত্র তাহারা বলিতে পারিল। যাহাদের সংবাদ জানা গেল তাহাদের উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজনের মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া গেল। খবর যাহাদের মিলিল না তাহাদের আপনজনেরা আবার নীরবে পদ্মার সীমাহীন বুকে দৃষ্টি পাতিয়া রাখিল। তাবে প্রত্যেকটি নৌকাই এই একটি আশার বারতা বহিয়া আনিতে লাগিল যে, কাহারও প্রাণহানি হইয়াছে- এ সংবাদ তাহারা শুনিয়া আসে নাই। বুক বাঁধিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতে পারে, হয়তো ব্যর্থ হইবে না।

আমিনুদ্দি ও নাসির এক সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। আমিনুদ্দির জন্যে কেহ ঘাটে আসে নাই। জহর আসিয়াছিল, নাসিরকে দেখিয়া সে শুধু বলিল, 'বাপজান, ফির্‌ল্যা আলি রে,?'-বলিয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেল। কাহারো মুখে কথা নাই। আমিনুদ্দিকে দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আমিনুদ্দি এদিক- ওদিক চাহিল, তার পর ভীত উৎসুক কণ্ঠে জহরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'খবর কও মিয়া বাই, ভালা নি আছে বেবাকে? চুপ মাইরা রইলা কেরে আঁই?'

কারো কিছু বলিবার ছিল না। হাত ধরিয়া জহর তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

তার পর আসিল কুবের ও গণেশ। আসিল তাহারা অনুকূলের নৌকায়, ধনঞ্জয়ের নৌকাটি ডুবিয়া গিয়াছে। বোকা গণেশের একটি পা মচকাইয়া গিয়াছিল, ঝড়ে নয়, পা পিছলাইয়া একটা সে আছাড় খাইয়াছিল ডাঙায়। উলুপী আজ সারাদিন এক রকম পদ্মাতীরেই কাটাইয়াছে, গণেশকে ধরিয়া সেই বাড়ি লইয়া গেল, কুবেরের জন্য কেহ আসে নাই। পরের মুখে সে তাহার গৃহের বৃত্তান্ত শুনিল। বড় ঘরটা পড়িয়া গিয়াছে? যে ঘর ছাইবার জন্য হোসেন মিয়া ছন দিয়াছিল। গোপীর পায়ে চোট লাগিয়াছে? বিবর্ণ মুখে কুবের বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। ঘরদুয়ার অনেকেরই পড়িয়াছে, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে আমিনুদ্দির, কিন্তু তাহার নিজের ঘরখানা পড়িয়া যাওয়ার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ কুবেরের কাছে আর কিছুই নয়। কবে আবার সে ঘর তুলিতে পারিবে কে জানে। মাথা গুঁজিবে কোথায়?

পথে দেখা হইল কপিলার সঙ্গে। কুবেরকে দেখিয়াই কপিলা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, বড় উচ্ছ্বাস কপিলার। বলিল, ফিরা আইছ মাঝি? মুখ রাখছেন-ঠাহুর আমার মুখ রাখছেন, আমি না মানত কইরা থুইছি, পাঁচ পহার হরিলুট দিমু।'

কুবের বিব্রত হইয়া বলিল, 'কাঁদ ক্যান?'

সঙ্গে চলিতে চলিতে কপিলা আত্মসম্বরণ করিল।

'পায় বিষম চোট পাইছে মাইয়া শুনছ, 'বিত্তান্ত?'

কুবের মাথা হেলাইয়া বলিল, 'হ। ফুইলা গেছে না?

'বিষম ফুলছে। দিনডা ভইরা চিল্লাইয়া মরছে মাইয়া।'

চারি দিকে ভাঙা গাছ, ভাঙা ঘর, পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত পথ, কুবেরের চোখে জল আসে। ঘরের কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল ঘর কই কুবেরের! ভাঙিয়া অঙ্গনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। পিসীর

ঘরে সকলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের ঢেঁকিটার উপর বসিয়া পড়িল। গোপী শুইয়া কাতরাইতেছে। পায়ে তাহার চুন-হলুদ মাখানো হইয়াছে, হাঁটুর কাছে বেজায় ফুলিয়াছে। মালার চোখে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি। গত রাত্রের প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ভীরু পঙ্গু নারীটিকে আধমরা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখনো সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। কুবের আসিয়া পড়াতে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পিসী ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঝড়বাদল ভূমিকম্প কিছুই পিসীর ভাত রাঁধা বন্ধ করিতে পারে না। খানিক পরে উঠিয়া কুবের ভাত খাইল। তার পর গোপীর কাছে একটু বসিল। যন্ত্রণায় মেয়েটার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে। কী করিবে কুবের, যন্ত্রণা লাঘবের কী মন্ত্র সে জানে, গোপীকে যাতে এতটুকু আরাম দিতে পারে। নীরবে চাহিয়া দেখা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মালা ধীরে ধীরে বলিতে থাকে, মড়মড় করিয়া ঘর ভাঙিয়া পড়ার সময় আতঙ্কে দিশেহারা হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাওয়ায় কীভাবে গোপীর উপর চালটা আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে থাকিলে মেয়েটার কিছু হইত না। ঝড়ের সময় যে বাহিরে যাইতে নাই, ঘরের মধ্যে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, সেটুকু বুদ্ধি তো মেয়ের নাই। শুনিতে শুনিতে কুবের ঢুলিতে থাকে।

হ, কুবেরের ঘুম পাইয়াছে। উন্মুক্ত নদীতীরে বসিয়া সে কাটাইয়াছে ঝড়ের রাত্রি, সকালে হাঁটিয়া আসিয়াছে দেবীগঞ্জে, দুটি মুড়ি শুধু সে খাইয়াছে, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্ভাবনায় ঢিপ ঢিপ করিয়াছে বুকের মধ্যে। এখন পেট্ ভরিয়া খাইয়া আর তাহার জাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। মালার সব কথা তাহার কানে যায় নাই। গোপীর মাথার কাছে সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে কোনো মতে কাত হইয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সন্ধ্যার আগে জেলেপাড়ার সকলেই ফিরিয়া আসিল। পদ্মার গ্রাসে কেহ যায় নাই। পীতম মাঝির নৌকাটি শুধু মাঝ-নদীতে ঝড়ের মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় ছিল পীতমের ছেলে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মাখন, কুবের প্রতিবেশী সিধু আর তাহার ভাই মুরারি-অর্ধমৃত অবস্থায় একটা চরে উঠিয়া রাত কাটাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, আর বলিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বাহাদুরি কাহিনী, পাহাড় সমান ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া কীভাবে তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

কয়েকটা দিন বড় গোলমালের মধ্যে কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে ঘরগুলি সংস্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কেতুপুরের দু-চারখানা ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, একদিন মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের সভাপতিত্বে গ্রামবাসীদের এক সভা হইয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্ত আর দুঃস্থদের জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হইল। অনন্ত বাবু নিজে দান করিলেন দশ টাকা, গ্রাম হইতে আরও পনের টাকা উঠিল। তাহার মধ্যে সাত টাকা দেওয়া হইল কেতুপুরের নন্দ ভট্টাচার্যকে; আহা, ব্রাহ্মণের দুখানা ঘর পড়িয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার জন্য দেওয়া হইল দশ টাকা-দু-টাকা পাঁচজনকে। বাকি টাকাটা বোধ হয় ফান্ডে জমা রহিল।

সুখের বিষয় দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এই সময় হোসেন মিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তার পর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না টাকা কর্জ দিমু না, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু-শ্যাষে নিকাশ নিয়া খত লিখুম, একটা কইরা টিপ দিবা।

তাহাই সই।

পুরাতন জীর্ণ ঘরের বদলে যদি নূতন ঘর ওঠে, খত লিখিয়া দিতে আর আপত্তি কি? ঘর যাহাদের পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলে খুশি হইয়া উঠিল। যাহাদের ঘর পড়ে নাই তাহারা দুঃখিত হইয়া ভাবিল, ঘরদুয়ার তাহাদেরও পড়িয়া গেলে মন্দ হইত না।

সকলেই সাগ্রহে হোসেন মিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিল, করিল না শুধু আমিনুদ্দি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না মিয়া, ঘর দিয়া কাম নাই।'

আমগাছের তলে তাহার ঘরখানা যেমন নিস্পেষিত হইয়া পড়িয়াছিল তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল। সত্যিই তো ঘর দিয়া আমিনুদ্দি কী করিবে? কে আছে আমিনুদ্দির? কাহার জন্য আবার সে দুঃখের দারিদ্র্যের নীড় বাঁধিবে? জেলেপাড়ার সকলেই আবার পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়াছে, আমিনুদ্দি কোথাও যায় না, কার জন্য পদ্মার অতল জলে সে জীবিকার সন্ধান করিবে? শুধু মেয়েটা আছে-মমীন। কেন আছে কে জানে! সারাদিন মমীন মৃদুস্বরে কাঁদে, আমিনুদ্দি চাহিয়াও দেখে না, না ডাকে কাছে, না বলে মেয়ের সঙ্গে কথা।

ক্রমে ক্রমে সকলের নূতন খুঁটি বেড়া নূতন চালার ঘরগুলি সমাপ্ত হইল। হোসেন মিয়া মজুরদের কী ইঙ্গিত দিয়াছিল সে-ই জানে, কুবেরের ঘরটা উঠিল সকলের আগে। ঘর দেখিয়া হোসেন মিয়া গোপীর জন্য বড় দরদ দেখাইল। বলিল, 'হাসপাতালে নিয়া যাও কুবির বাই, জবর চোট পাইছে মালুম হয়।'

তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, 'টিপসই দেও কুবির-একুশ টাকা দশ আনার খত লিখিছি-বাদ দিছি দুই টাকা। টিপসই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা,-না দিলি মামলা করুম না বাই।'-হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিল, 'জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাবে থাকব-না-ত কিসির কাম খত দিয়া?

কুবের বলিল, 'পুরান বাঁশ, পুরান বেড়া দিলি খরচ কম হইত মিয়া বাই।

'ক্যান? পুরান বাঁশ দিয়া ক্যান? খরচার লাইগা ভাইব না, খরচ তো দিছি আমি। না, দিই নাই?'

'হ, মিয়াবাই, দিছেন, আপনেই দিছেন।'

টিপসই দিয়া কুবের হোসেনের মুখের দিকে চাহিল। বড় ভয় করে কুবের হোসেন মিয়াকে, বড় টান তাহার হোসেন মিয়ার দিকে। কী যাদুমন্ত্রে তাহাকে বশ করিয়াছে লোকটা?

গোপীর পায়ের ব্যথাও কমে না, ফোলাও কমে না। মেয়েটাকে নিয়া মহা মুশকিলে পড়িয়াছে কুবের। মালার মতো

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গোপীও কি শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হইয়া যাইবে? কী ব্যবস্থা করা দরকার কুবের বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হোসেন মিয়ার কথামতো সদরের হাসপাতালে লইয়া যাইবে নাকি? সে তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়। অতখানি পথ গোপীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? ব্যথায় সে বিছানাতেই পাশ ফিরিতে পারে না, অত নাড়াচাড়া তাহার সহিবে কেন? অথচ পায়ের যা অবস্থা গোপীর শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা না করিলে নয়।

ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল। চরডাঙ্গা হইতে একদিন আবার আবির্ভাব ঘটিল অধরের। আবার সে রাগারাগি করিয়া সকলকে লইয়া যাইতে চাহিল। ছেলেমেয়েগুলি তাহার সঙ্গে ফিরিয়া গেল চরডাঙ্গায়, কপিলা গেল না। বলিল, 'কেন, ঘর পড়িয়া গেলে ঢেঁকিঘরটাতে যখন তাহারা সকলে এক সঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই? এখন নূতন ঘর উঠিয়াছে, থাকিবার কোনো অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া?' কুবের ইহাতে সায় দিয়া বলিল, 'হ, কেন যাইবে কপিলা তাহাদের এই বিপদের সময়?' কপিলা সত্যই প্রাণ দিয়া সকলের সেবা করিতেছিল, বড় কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল কুবের তাহার কাছে। বড় ভালো মেয়ে কপিলা। কেন যে ওর বোকা স্বামীটা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে?

লখার সঙ্গে কপিলা এক দিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর দেখিতে গিয়োছে, খানিক পরে কুবেরও গুটিগুটি গিয়া হাজির। গিয়া দেখে শীতলের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছে কপিলা। বাবুদের কর্মচারী শীতল, পূজাও বাবুদেরই.... ভাবখানা দেখ শীতলের, সে-ই সর্বেসর্বা। ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া এত কথা কিসের কপিলার? তার পর শীতল প্রসাদ চাহিয়া আনিয়া কপিলার আঁচলে বাঁধিয়া দেয়, কপিলা একগাল হাসে। এত লোকের মধ্যে কপিলার ওই নির্লজ্জ আচরণে রাগে কুবেরের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। সে ডাকিয়া বলে, 'লখা! চল, বাড়িত্ যাই।'

কপিলা বলে, 'মাঝি আইছ নাকি? খাড়াও মাঝি, আমি যামু, মারে পেন্নাম কইরা লই।'

কুবের বলে, 'লখা আইলি রে হারামজাদা পোলা?'

কপিলা প্রণাম শেষ করিতে করিতে লখাকে সঙ্গে করিয়া কুবের জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থর। না, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয় তো নিক, অন্ধকার হইয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে বলিবে। এতখানি অন্ধকার রাস্তা শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা? তাহার চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরের দাঁড়ানোই ভালো।

বিড়ি কিনিতে কিনিতে কপিলা আসিয়া পড়িল। কুবের কথাটি বলিল না, তিন জনে নীরবে চলিতে লগিল বাড়ির দিকে। কপিলা আড়চোখে কুবেরের দিকে তাকায়, কিছু ঠাহর হয়না অন্ধকারে। চলিতে চলিতে দেখা হয় রাসুর সঙ্গে, যুগীকে লইয়া সে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে।

কপিলা যুগীকে বলে, 'বইন, এক কাম করবা? আমাগো লখারে লইয়া যাও'

কুবের আপত্তি করিয়া বলে, 'ক্যান, ঠাকুর দেখে নাই লখা?'

কপিল বলিল, 'পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখ্যা? তোমার লখা বুড়া ত হয় নাই মাঝি, এক নজর দেইখা কাল দিয়া বাড়িত্ ফিরব? যা রে লখা যুগী মাসির লগে-দেইখো বইন পোলারে, পোলা বড় বজ্জাত।'

মতলব কি কপিলার? লখাকে সরাইয়া দিল কেন? কিছুই যেন বুঝিতে পারা যায় না। কপিলা নীরবে পথ চলে, কুবের মনে মনে রাগিতে থাকে। শেষে একটা তেঁতুল গাছের তলে, পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে যেখানে, হঠাৎ কুবের শক্ত করিয়া কপিলার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'শীতলের লগে অত কথা কিসের তর আঁই?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হঠাৎ বড় যেন করুণ কণ্ঠে কপিলা বলে, 'মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।'

কুবের আঁচল ছাড়িয়া দেয়।

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, 'মন কাতর ক্যান রে কপিলা?'

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!'

'সোয়ামীরে মনে পরে মাঝি।'

হ? আগাগোড়া সব তাহা হইলে ফাঁকি কপিলার, সব ছল, এতক্ষণ রসিকতা করিতেছিল কুবেরের সঙ্গে! ভালো, কুবেরও রসিকতা জানে। কপিলার গালটা সে টিপিয়া দেয়, হি হি করিয়া হাসে, বলে, 'তাই ক কপিলা তাই ক! যে সোয়ামী দূর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগা মনডা পোড়ায় তর! গেলেই পারস সোয়ামীর ঘর?'

'যামু।'

বলিয়া কপিলা হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে।

৬

সে দিন রাত্রে গোপীর পায়ের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া গেল।

তাহাকে নূতন ঘরে আনা হইয়াছিল, সারারাত সে ছটফট করিয়া গোঙাইয়া কাটাইয়া দিল। মালা জাগিয়া বসিয়া রহিল তাহার শিয়রে। কুবেরও অনেক রাত অবধি জাগিয়া রহিল। তার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল বটে কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। শেষরাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে ডাকিল, 'গোপীর মা?'

জবাব দিল কপিলা, 'গোপীর মা ঘুমায়।'

কুবের উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'যা তুই ঘুমা গা কপিলা, আমি বইয়া থাকি।'

কপিলা চাপা গলায় বলিল, 'আরে পুরুষ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা কপিলা। কাউয়ায় ডাক পাড়ে শুনছ মাঝি।'

'তাইতো বটে! ফরসা হইয়া আসিয়াছে যে!'

ঝাপ খুলিয়া কুবের বাহিরে গেল। গণেশের বাড়ি গিয়া ডাকাডাকি করিয়া তুলিল গণেশকে। যুগল কাল বোনের নেমতন্ন খাইতে আসিয়া রাত্রে এখানেই ঘুমাইয়াছিল, সেও উঠিয়া আসিল। কুবের বলিল, 'গণেশ, মাইয়ারে ত হাসপাতালে নেওন লাগে, বড় কাতর মাইয়া, রাইত ভইরা চেঁচাইয়া মরছে।'

গণেশ বলিল, 'হ। ব-কুবির, তামুক খা। হাসপাতালে নেওন ত সহজ কথা না! কিবা নিবি ভাবছিস নি?'

'নাও নিয়া যামু ,আবার কিবা?'

সমস্যার সমাধানে গনেশ খুশি হইয়া বলিল,'তবে চিন্তা নাই, যুগইলার নাওখান মিলব আইজ, নাও নিয়া আইছে যুগইলা-নাওখান দিবি না যুগইলা তর?

যুগল সাগ্রহে নৌকা দিতে সম্মত হইল বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। খুব বুঝি ফুলিয়াছে গোপীর পা-টা। কোথায় চোট লাগিয়াছে? আগে কেন মেয়েকে হাসপাতালে নেয় নাই কুবের-

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আগেই লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আজ যদি হাসপাতালে লইতে হয়, দেরি করিয়া লাভ কী? বেলা হইয়া গেলে হাসপাতালে ডাক্তারকে পাওয়া যাইবে না।

একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপীকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা-বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে-এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটখাট ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান।

কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল, তার পর গোপীকে তুলিয়া শোয়ানো হইল। যন্ত্রণা ও ভয়ে গোপীর মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হাসপাতাল? না জানি কী ভয়ঙ্কর সেই স্থান! কে জানে সেখানে কী হইবে তাহার! কপিলার একটা হাত গোপী সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

নৌকা খোলা হইবে এমন সময় দেখা গেল রাসু ছুটিয়া আসিতেছে। নদীতীরে পৌঁছিয়া সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল।

কুবের জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে রাসু?'

রাসু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'আমিও যামু।'

চলুক! এত বড় নৌকা, স্থানাভাব হইবে না। বেশি লোক সঙ্গে থাকিলে গোপীকে উঠানো - নামানোর বরং সুবিধাই হইবে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি, সেইখানে সরকারি হাসপাতাল। কেতুপুর হইতে আমিনবাড়ি বেশি দূর নয়, ঘণ্টা তিনেক লাগিল পৌঁছিতে। রাসুর সাধ ছিল গোপীকে ঘাট হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত লইয়া যাইতে সে-ও কাঁধ দিবে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। সকলকে নৌকায় বসিয়া থাকিতে বলিয়া যুগল নামিয়া গেল, খানিক পরে কোথা হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া লইয়া আসিল একটা পালকি। যুগল কি কম পাকা লোক! পালকি চাপিয়া গোপী হাসপাতালে গেল।

হাসপাতালে তখন রোগীর ভিড় কমিয়াছে। একটা ছোট ছেলের ফোড়া অপারেশন করা হইতেছিল, কী তাহার তীব্র চিৎকার, গোপী তো দেখিয়া-শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিল। কুবেরের মুখখানা শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ভীত ও সন্ত্রস্ত। শুধু অবিচলিত আছে রাসু। ময়নাদ্বীপ হইতে পালাইয়া আসিয়া নোয়াখালির হাসপাতালে সে পনের দিন কাটাইয়া দিয়াছিল, এ তাহার পরিচিত স্থান। সকলকে সে অভয় দিয়া বলিতে লাগিল, 'ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।'

সে-ই গিয়া ডাক্তারকে গোপীর অবস্থা বলিয়া লিখাইয়া আসিল। কী গর্ব রাসুর। দেখুক কুবের, কেমন চটপটে পাকা লোক সে ! দেখিয়া রাখুক!

বেলা প্রায় এগারোটার সময় অবসর করিয়া ডাক্তারবাবু গোপীর পা পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া রাগের সীমা রহিল না ডাক্তারের। রাসুই কি না বুক ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল, তাহাকে গোপীর অভিভাবক ঠাওরাইয়া ধমক দিয়া ডাক্তার আর কিছু রাখিলেন না। এতকাল কী করিতেছিল তাহারা, বসিয়া বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল? আগে আনিতে পারে নাই গোপীকে? পা যদি এবার কাটিয়া বাদ দিতে হয়?

অপারেশন টেবিলে শুইয়া গোপী কপিলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ছিল, গোঙাইয়া সে তো কাঁদিতে থাকেই, কপিলাও মৃদু সুর তোলে কান্নার- তার পর ডাক্তারের ধমকে আচমকা স্তব্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার ভয়ানক কথা বলিলেন। এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে গোপীকে। তবে এ - কথাও তিনি বলিলেন যে, রাখা না-রাখা গোপীর বাপের খুশি, জোরজবরদস্তি নাই।

হাসপাতালের বারান্দায় পরামর্শ সভা বসিল। ডাক্তারের ধমকে রাসু বড় দমিয়া গিয়াছিল, সে আর কথা বলিল না-হয়তো এতক্ষণ গোপীর অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মনটাও তাহার খারাপ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। ঘরের মধ্যে গোপী কাঁদিতে লাগিল-

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'আগো মাসী, আমি থাকুম না, আমারে নিয়া যাও'-আর বাহিরে কুবের, গনেশ আর যুগল গম্ভীর মুখে বলাবলি করিতে লাগিল যে, এবার কী করা কর্তব্য। পরামর্শ করা একান্ত মিছে, ডাক্তার যে কথা বলিয়াছে তার পর গোপীকে না রাখিলে চলিবে না এখানে, তবু তাহারা অজ্ঞ ও ভীরু গ্রামবাসী কি না, দীর্ঘ পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই তাহারা করিতে পারে না।

গোপীকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। তার পর আর তাহাদের গোপীর কাছে থাকার উপায় রহিল না। আবার সেই চারটার সময় আসিয়া মেয়েটার সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিবে।

গোপী কপিলাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'আগো মাসী, নিয়া যাও, কই থুইয়া যাও আমারে।'

হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা ফিরিয়া গেল নদীর ঘাটে । পথে কিনিয়া লইল কিছু চিড়া-মুড়ি। এত বেলা অবধি কেহ তাহারা কিছু খায় নাই।

নীরবে সকলে জলযোগ শেষ করিল। এবার? কী করিবে তাহারা এবার?

যুগলের থাকিবার উপায় নাই। নৌকা তাহার ভাড়া হইয়া আছে, সকালবেলাই তাহার দেবীগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল। কুবের এখন গ্রামে ফিরিবে তো? গ্রামের ঘাটে সকলকে নামাইয়া দিয়া যুগল সোজা চলিয়া যাইবে দেবীগঞ্জে।

কুবের বলিল,'তোমরা যাও, বৈকালে মাইয়াটারে একবার না দেইখা আমি যামু না।' রাসু বলিল, 'আমি থাকি আঁই?' কুবের বলিল, না। রাসু, যা গিয়া তুই। কই থাকুম কি বিত্তান্ত ঠিক নাই, তুই থাইকা করবি কী?

গণেশ থাকিতে চাহিল, কুবের তাহাকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিল। কপিলা অবশ্য ফিরিয়া যাইবে, তাই তাহার থাকা না-

থাকার কথাই উঠিল না, কপিলাও কিছু বলিল না। কিন্তু কপিলাই শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠিল না। সেও বিকাল পর্যন্ত এখানে থাকিবে, গোপীকে আর একবার না দেখিয়া কি সে ফিরিতে পারে? আহা, মাসী-মাসী বলিয়া মেয়েটা হয়তো কাঁদিয়া মরিতেছে। কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই।

কপিলা কোনো কথাই কানে তুলিল না।

নৌকা চলিয়া গেল।

'কী দেখ মাঝি? কী ভাব?' কপিলা বলিল।

'জিগানের কাম কী তর?' কুবের বলিল।

'গোসা কর ক্যান? উই দেখ জাহাজ আহে।'

সেইখানে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, চক্রাকারে পাক দিয়া জাহাজ আসিয়া ভিড়ে জেটিতে। কী ভিড় হইয়াছে আজ জাহাজে! আজ পূজা শেষ, আজও দেশ-দেশান্তরে মানুষ গৃহে ফিরিতেছে। আর, কী অদৃষ্ট কুবেরের, মেয়েটাকে আজ এই বিদেশে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া মূঢ়ের মতো সে দাঁড়াইয়া আছে নদীতীরে, কোথায় যাইবে কী করিবে ঠিক নাই। ভোঁ দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া যায়। নদীর আলোড়িত জল ঢেউ তুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে। মেয়েটার জন্য এমনি ঢেউ উঠিয়াছে কুবেরের বুকে।

হঠাৎ কপিলা বলিল ,'পয়সা-কড়ি আনছ?'

'হ'

'কত?'

'তা দিয়া কী কাম তর?'

'আমি কিছু আনছি, লাগলে নিও।'

কপিলা আঁচলে গেরো বাঁধা পয়সা দেখাইল।

কুবের হাঁ না কিছু বলিল না। জেটি নির্জন হইয়াছে দেখিয়া খানিক পরে জেটিতে গিয়া ছায়ায় তাহারা বসিয়া রহিল।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বেলা পড়িয়া আসিলে দু'জনে হাসপাতালে গেল। কুবেরের এবার প্রথম মনে তো হইল থাকিয়া বুঝি ভালো করিয়াছে কপিলা। নতুবা এমন করিয়া গোপীকে সে নিজে তো সান্ত্বনা দিতে পারিত না কপিলার মত! তাছাড়া যে কাণ্ড আজ ডাক্তার করিলেন গোপীকে লইয়া, কপিলা না থাকিলে বুক বাঁধিয়া সে সময় কে থাকিত গোপীর কাছে? গোপীর হাঁটুর হাড়ই শুধু ভাঙে নাই, মস্ত একটা বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়া গিয়াছিল মাংসের মধ্যে, পা ফুলিয়া সেটাকে আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তার এ-বেলা সেটা টানিয় বাহির করিলেন, তার পর ভাঙা হাড়টা যত দূর সম্ভব স্বস্থানে বসাইয়া কোমরের কাছ হইতে পা পর্যন্ত কাঠের তক্তা বসাইয়া বাঁধিয়া দিলেন ব্যান্ডেজ। কুবের এসব দেখিল না, বাহিরে বসিয়া সে শুধু গোপীর আর্তনাদ শুনিল।

দু জনে যখন তাহারা হাসপাতাল হইতে নামিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা বেশি বাকি নাই। দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। গ্রামেই এখন তাহাদের ফিরিতে হইবে। এখানে রাত কাটাইবে কোথায়? কাল আবার কুবের আসিয়া গোপীকে দেখিয়া যাইবে। নদীর ঘাটে গিয়া কুবের নৌকায় নৌকায় চেনা মাঝি খুঁজিয়া বেড়াইল। চেনা মাঝি দু চার জন মিলল বটে কিন্তু আজ বিজয়ার সন্ধ্যায় নৌকা তো কেহ খুলিবে না। দেবীগঞ্জের দিকে যাহাদের যাওয়া দরকার ছিল, দিনে দিনে তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তবে গহনার নৌকা ছাড়িবে একটা, কুবের ইচ্ছা করিলে ভাড়া দিয়া যাইতে পারে। নতুবা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, যে নৌকাই কেতুপুরের দিকে যাক কুবের তাহাতে গ্রামে ফিরিতে পারিবে।

'কত নাও যাইবে কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই?' বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যেকোনো মাঝির নৌকায় রাত্রি যাপনের অধিকার তাহার জন্মগত, কিন্তু এখানে রাত কাটানো মুশকিল।

পয়সা দিয়া গহনার নৌকায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কত ভাড়া লইবে কে জানে! জিজ্ঞাসা করিতে গহনার নৌকার মাঝি বলে, সোনাখালি হইয়া তীরে তীরে তাহারা দেবীগঞ্জ পৌঁছায়, পদ্মা পার হইয়া কুবেরকে কেতুপুরে তাহারা নামাইয়া দিতে পারিবে না। হাসাইলের খাল পর্যন্ত তাহারা তীর ঘেঁষিয়া চলিবে, কুবের সেখানে নামিতে পারে, ভাড়া মাথাপিছু তিন আনা।

হাসাইলের খাল হইতে কেতুপুর দু-ক্রোশের কম নয়। এই রাত্রে অতখানি পথ কপিলা হাঁটিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কুবের জিজ্ঞাসা করে, 'কী করি কপিলা?'

কপিলা বলে, 'না গেলাম আইজ? কাইল বিয়ানে গোপীরে দেইখা মেলা করুম?'

'থাকুম কই? নায়?'

তাই কি হয়! ডাকাত না গুণ্ডা নৌকার মাঝি কে জানে, কপিলা কি পারে এই নদীর ঘাটে নৌকায় শুইয়া থাকিতে? ওই তো ঘাটের হোটেল দেখা যায়, ওখানে ঘর ভাড়া নেওয়া যাক।

কী আর করিবে কুবের, দরদস্তুর করিয়া ছ আনায় বড় একটা ঘরের একদিকে চাঁচের বেড়ায় ঘেরা স্থানটুকু ভাড়া করে। দরজা বা ঝাঁপ কিছুই নাই। ঢুকিবার জন্য একটু ফাঁক রাখিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে। ঘরের মধ্যে সারি সারি মোটা পাটি পাতা, অতিথিরা রাত্রে শয়ন করিবে-ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে একখানা পাটিতেই মেঝের প্রায় সবটা ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে খোলা চালার নিচে খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘরেও কতকগুলি পিঁড়ি, চালটার মাঝখানে একটা কালি-পড়া লণ্ঠন রাখা হইয়াছে, বাকি সর্বত্র জ্বলিতেছে কেরোসিনের কুপি।

কুবের গিয়া চালার নিচে বসিয়া খাইয়া আসে। চালার বাহিরে সকলের দিকে পিছনে ফিরিয়া বসিয়া খোলা আকাশের নিচে খায় কপিলা। তার পর এক পয়সার পান কিনিয়া আনে কুবের, ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে বসিয়া দু'জনে নীরবে পান চিবায়। সারা দিন

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কত হাঙ্গামা, কত হাঁটাহাঁটি গিয়াছে, দুপুরে স্নান হয় নাই, পেটে ভাত পড়ে নাই, ক্রমে ক্রমে দু জনেরই ঢুল আসিতে থাকে।

কুবের শুইয়া পড়িলে এতক্ষণে কপিলা চুল খুলিয়া দেয়, আঙুল দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলে, 'গোপীর লাইগা পেরানডা পোড়ায় মাঝি, স্যায় বুঝি ডরাইয়া কাইন্দা মরে।'

বুঝিতে পারা যায় কপিলা কাঁদিতেছে।

'কেডা জানে কবে মাইয়া সাইরা উঠ্যা বাড়িত যাইব। মাইয়ারে ফেইল্যা ক্যামনে ফিরুম মাঝি কাইল?'

কুবের কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে কাঁদিতেছে কপিলা, ওখানে মালাও হয়তো কাঁদিতেছে এখন। পথের দিকে চাহিয়া কত কী হয়তো ভাবিতেছে মালা। আর গোপী কি করিতেছে তা যেন ভাবাও যায় না।

পর দিন ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল কপিলার! হাই তুলিয়া সে উঠিয়া বসিল, ঠেলা দিয়া কুবেরকে তুলিয়া দিল।

মুড়ি আর বাতাসা নিয়া কুবের ফিরিয়া আসিল। দু-মুঠা খাইয়া কপিলা বলিল, আর সে খাইবে না। না খাক, কুবেরের পেটে জায়গা আছে ঢের। ধীরে ধীরে মুড়ি আর বাতাসা শেষ করিয়া বলিল, 'ল, যাই হাসপাতাল।'

তখন সবে রোদ উঠিয়াছে। এত সকালে গোপীর সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিল না। নটা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে বসিয়া থাকিতে হইল। তার পর ঘণ্টাখানেক গোপীর কাছে থাকিয়া, তাহাকে অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিল। জহরের শালা নূরুলের নৌকা কাঠের বোঝা নামাইয়া দেবীগঞ্জে ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই নৌকায় তাহারা উঠিয়া বসিল।

গ্রামের ঘাটে নামিয়া কুবের বলিল, 'বাড়িত্ যা কপিলা, আমি গণেশের লগে দেখা কইরা যাই।'

বাড়িতে যদি ঝড়ঝাপটা ক্রন্দন ঘনাইয়া থাকে তবে প্রথম ধাক্কাটা কপিলার উপর দিয়াই যাক। কপিলা কিন্তু একা বাড়ি যাইতে রাজি হইল না।

তখন আর কথাটি না বলিয়া কুবের হন হন করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইল সেই সাগ্রহ গোপীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

বাড়ি গিয়া কুবের দেখিল, মালার কাছে কপিলা সবিস্তারে আমিনবাড়ির কাহিনী বলিতেছে। কাছে চাটাইয়ের উপর সে বসিয়া পড়িল।

দুই দিনের মধ্যে আর গোপীকে দেখিতে যাওয়া হইল না। জীবিকা অর্জন করিতেই কুবের ব্যস্ত হইয়া রহিল। পরের দিন সকালে মালা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ। মেয়েটাকে সে যে কোথায় রাখিয়া আসিল আর কি তাহার খবর লইতে হইবে না। জন্মের মতো রাখিয়া আসিয়াছে নাকি মেয়েকে, এমন যে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে কুবের?

সারা রাত মাছ ধরিয়া কুবের তখন বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাত খাইয়া দুপুর বেলা আমিনবাড়ি রওনা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে মালাকে শান্ত করিল। কে জানে কপিলা আজ সঙ্গে যাইতে চাহিবে কি না। কপিলা কিছু বলে না, এক বার সামনে আসে এক বার অন্তর্হিত হয়।

খাইতে বসিয়া কুবের বলে, 'খাইয়া উঠ্যাই আমিনবাড়ি রওনা দিমু কপিলা।'

'ফিরবা না আইজ?'

'কেডা জানে!'

খাইয়া উঠিয়া কুবের ময়লা চাদরটি গায়ে জড়াইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

রওনা হওয়ার সময় কুবেরকে চার আনা পয়সা দিয়া কপিলা বলিল, গোপীর ফল কিনা দিবা মাঝি। তার পর মালাকে বলিল, 'মাঝির লগে যামু নাকি দিদি?'

মালা বলিল, 'তর গিয়া কাম কী?'

তখন কপিলা বিষণ্ণভাবে একটু হাসিল, কুবেরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাঝি কী কও?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কুবের মাথা নাড়িল, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আমিনবাড়ি সে পৌঁছিল অপরাহ্ণে, কপিলার পয়সা দিয়া স্টিমারঘাট হইতে কমলালেবু কিনিয়া গোপীকে দেখিতে গেল, নদী তীরে ফিরিয়া অসিল সন্ধ্যাবেলা। আজ বাড়ি ফিরিবার নৌকার অভাব নাই, তবু কুবেরের কেন যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, অনেক রাত্রি অবধি নদীতীরে বসিয়া থাকিয়া সে হোটেলে ভাত খাইতে গেল। খাইতে খাইতে সে শুনিতে পাইল বাজারে আজ ভাসান যাত্রা হইতেছে। আজ কুবের কাছে না থাকিলে কেহ ভয় পাইবে না। খাইয়া উঠিয়া সে বাজারের দিকে পা বাড়াইল।

বাজারে টিনের চালার নিচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের এক পাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এত রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের শখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না; একে ওকে দিয়া পড়াইয়া পাঠ মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে- বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষায় এক অপরূপ খিচুড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনে কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনি অভাব। বালক লখীন্দরের পাশে তাহার চেয়ে এক হাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকার চিত্তে পার্ট বলে-গলাটি মিহি বলিয়া চমৎকার মেয়েলি ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তবু রাত জাগিয়া ভিড় করিয়া সকলে ভাসান-যাত্রা শোনে, একবার নয় বহুবার। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সঙ্গত, মশালের লাল আলো, আলু-বেচা তেল-বেচা অভিনেতা- তবু কী মোহ এ যাত্রার! কুবের ঠায় বসিয়া থাকে। ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা-মনসা একটা গান করেন, চাঁদ-সদাগর দুটো কথা বলে, মৃত লখীন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার

মরিয়া যায়। কোথায় কখন কোন্ দৃশ্যের শুরু, সর্পদ্রষ্ট লখীন্দরের জন্য বেহুলার বহুল বিলাপের পর মা-মনসা আবার কোন্ গান গাহিয়া চাঁদ-সদাগরকে ভয় দেখাইয়া যান যে তাঁহাকে পূজা না করিলে লখীন্দরকে সাপে কাটিবে, এসব বুঝিবার দরকার হয় না। কুবের মন দিয়া যাত্রা শোনে। রাত্রি শেষ করিয়া যাত্রা শেষ হইলে পেঁয়াজের যে খালি বস্তাটার উপর সে এত ক্ষণ বসিয়াছিল তাহার উপরেই কাত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমানোর সুযোগ সে পায় না। সকাল হইতে না হইতে তাহাকে ঠেয়িলা তুলিয়া দেওয়া হয়। সেখানে এবার দোকান বসিবে।

অনেক বেলায় সে গ্রামে ফেরে। দেখিতে পায় বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাস।

লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নিচে এক জোড়া গোঁফ-খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কাহারো সে তোয়াক্কা রাখে না। কুবেরের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। কে জানে কেন আসিয়াছে শ্যামাদাস!

শ্যামাদাসের আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে বেশি দেরি হইল না। এ পক্ষের বৌটা তাহার মরিয়া গিয়াছে। কপিলাকে সে নিয়া যাইবে। কখন যাইবে? বেলা পড়িয়া আসিলে এক সময় রওনা হইয়া যাইবে, সে জন্য কী! কুবের যদি খাতির করিয়া একটা দিন থাকিয়া যাইতে বলে তাহাতেও শ্যামাদাসের আপত্তি নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলে, কপিলা এক সময় আসিয়া ফিস-ফিস করিয়া স্বামীর কানে কী সব গোপন কথা বলে, তার পর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসীর ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।

এত বেলায় কুবের ফিরিয়া আসিয়াছে, কই খাওয়ার কথা কপিলা তো বলিল না? কুবেরের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন কি কপিলার ফুরাইয়া গিয়াছে? গোপীর কথা তো কিছু সে জিজ্ঞাসা করিল না?

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড় খসখস করিতেছিল, অনেক দিন তেল মাখা হয় নাই। শ্যামাদাস আসিয়াছে বলিয়াই কপিলা বোধ হয় আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে। কালো একটি বোতলে বিলাসিতার এই উপকরণটি কপিলা সর্বদা মজুদ রাখে, একটা কিছু উপলক্ষ পাইলেই বোতলটা কাত করে মাথায়। শ্যামাদাসকে বসিতে বলিয়া কুবের কপিলার কাছে একটু তেল চাহিল। কপিলা করিল কি, রাঁধিবার তেল-রাখা বাঁশের পাত্রটি আনিয়া বলিল, 'ধর মাঝি, হাত পাত।' কুবের হাত পাতিলে পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল, এক ফোঁটা তেলও কুবেরের হাতে পড়িল না।

কপিলা বলিল, 'আই গো আই, ত্যাল তো নাই।'

বলিয়া কী হাসি কপিলার!

কুবের কথাটি বলিল না, বাঁশের পাত্রটি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুর বেলায় অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতরে গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল! কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেল জবজবে করিয়া ছাড়িবে।

সারা দিন কপিলার সঙ্গে সে কথা বলিল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মাছ ধরিতে যাওয়ার সময় তামাকের গোলাটা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একা সে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষায়, এই সময় গণেশ ও ধনঞ্জয় আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল, তার পর মৃদু জ্যোৎস্নায় পদ্মার রহস্যময় বুকে নৌকা আসিয়া গেল, কিন্তু তামাক পৌঁছাইয়া দিতে কেহ আসিল না।

পর দিন কপিলাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামাদাস চলিয়া গেল।

ইলিশের মরসুম শেষ হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের তিনটি নৌকা ইলিশ মাছ ধরার কাজে লাগানো হইয়াছিল, একটিতে থাকিত সে নিজে, অন্য দুটিতে তাহার দুই ছেলে। আশ্বিনের ঝড়ে একটি নৌকা ভাঙিয়া গিয়াছে। এবার একটি নৌকা সে রাখিল মাছ ধরার জন্য, অন্যটি লাগানো হইল ভাড়া খাটিবার কাজে। ছেলেরা মাছ ধরিবে, নিজে সে এক জন লইয়া নৌকা বাহিবে।

কুবেরকে ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। গণেশকে সে তাহার নৌকার মাঝি হইতে বলিল। কিন্তু গণেশ কি না বোকা, সে গেল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে কুবেরের কাছে।

কুবের রাগিয়া বলিল, 'যা যা খাট গিয়া আজান খুড়ার নায়। আমারে জিগ্যাস ক্যান!'

কুবের অনুমোদন না করিলে তাহা হইবার নয়, গণেশ ধনঞ্জয়কে বলিয়া আসিল তাহার নৌকায় একা সে মাঝির কাজ করিবে না, কুবের যদি করে তবেই সে করিবে, নতুবা নয়। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'যা মর গিয়া তবে। পঞ্চাশ জন মাঝি রাখুম, কলের জাহাজ পাইছস, না?

গণেশ তাহা জানে না। চির দিন সে কুবেরের কথায় নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, কলের জাহাজ হোক আর পানসি হোক, কুবের যেখানে নাই গণেশও নাই সেখানে! কুবেরের দাওয়ায় বসিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিল, আর কুবের গম্ভীর চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল, এবার কী করিবে। মাঝিগিরিই সে করিবে সন্দেহ নাই, তবু গম্ভীর- চিন্তিত মুখে অন্য কিছু করা যায় কি না ভাবিতে কুবের চির দিন বড় ভালোবাসে। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুবেরের অভাব বাড়িয়াছে। ঘরের লক্ষ্মী যেন চলিয়া গিয়াছে কপিলার সঙ্গে, পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হইতেছে না। সময়টা পর্যন্ত পড়িয়াছে খারাপ। জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় একটা ফসল নষ্ট হইয়াছিল, পাটের কল্যাণে আমন ধানের ফসলও হইয়াছে কম। চাষীদের ঘরে ধান নাই, আছে পাট-

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কুবেরের ঘরে কিছুই নাই। পাটের উপর চাষীর অনিশ্চিত মরণ-বাঁচন, কুবেরের জীবন ধারণ সুনিশ্চিত মাঝিগিরিতে-সেটা ভালোমতো জুটিতেছে না। একটা নৌকা যদি কুবেরের থাকিত! পদ্মার ঘাটে ঘাটে তবে সে কুড়াইতে পারিত জীবিকা, পরের নৌকায় লগি ঠেলিতে পাইবার ভরসায় বসিয়া থাকিতে হইত না।

ভোরবেলা এখন নদীর বুক জুড়িয়া থাকে কার্তিকের কুয়াশা, যদিও অগ্রহায়ণ আসিয়া গিয়াছে। জলের তল হইতে মাঠঘাট মাথা তুলিয়াছে। কোথাও রবিশস্যের চারা উঁকি দিয়াছে, কোথাও সবে শস্যবীজ বপন করা হইতেছে। রাত্রে অল্প অল্প শীত করে, গায়ে কাপড় দিতে হয়।

কুবেরের মন বড় খারাপ। কিছু ভালো লাগে না। গোপী হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ভাঙা হাঁটুটি তাহার শক্ত হইয়া গিয়াছে, সে হাঁটিতে পারে না। ভবিষ্যতে আবার কোথায় হাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক করিয়া দিলে খোঁড়াইয়া হয়তো সে হাঁটিতে পারিবে, চলন তাহার স্বাভাবিক হইবে না কোনোদিন। যুগলকে জামাই করার আশা নাই। মেয়ের বিবাহ দিবার এবং সে উপলক্ষে কিছু টাকা পাইবার ভরসাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কী উপায় হইবে গোপীর?

রাসু মাঝে মাঝে আসে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, গোপীর অবস্থা দেখিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইয়াছে। গোপীর হাঁটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডাক্তার কী বলিয়াছে রাসু খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে, এক-এক দিন টিপিয়া-টুপিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যায়। কী সন্তর্পণে সে যে স্পর্শ করে গোপীর হাঁটু!

মালা হঠাৎ রাসুকে বড় খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগল অবস্থাপন্ন লোক, গোপীর দিকে সে আর ফিরিয়া চাহিবে না, চালচুলাহীন রাসু হয়তো গোপীকে গ্রহণ করিতে পারে।

বড় দো টানায় পড়িয়াছে রাসু। আজ সে চাহিলেই গোপীকে পায়, এক পয়সা পণও তাহাকে দিতে হইবে না-কিন্তু সে কি এই গোপীকে চাহিয়াছে, এই পঙ্গু মেয়েটাকে? খোঁড়া মালাকে লইয়া কুবের সংসার পাতিয়াছে, অসুখী কুবের নয়, দারিদ্র্যের পীড়নে

সে কষ্ট পায় বটে কিন্তু পারিবারিক জীবনটি তাহার কামনা করিবার মতো-গোপীকে লইয়া হয়তো সে এমনি সংসার পাতিয়া বসিতে পারিবে। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে রাসুর। খোঁড়া বৌ! হয়তো জীবনে কোনোদিন সে দাঁড়াইতে পারিবে না-যদি পারেও লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিবে, পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো তাহার পুষ্টি হইবে না, চিরকাল কুৎসিত দেখাইবে তাহাকে।

শেষ পর্যন্ত গোপীর পায়ের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় দেখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করার জন্য প্রতীক্ষা করাও বিপজ্জনক। হাসপাতালের ডাক্তার যদি পা'টিকে ঠিক আগের মতো করিয়া দেয়? মরা মানুষ বাঁচায় ডাক্তার, কত ওষুধ কত যন্ত্রপাতি ডাক্তারের, একটা ভাঙা পা ঠিক করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নয়। তখন রাসুকে কি কুবের জামাই করিতে চাহিবে? আপসোস করিয়া মরিতে হইবে রাসুকে তখন।

'সাইরা যাইব কয় নাই ডাকতর?' রাসু জিজ্ঞাসা করে।

'হ।' কুবের জবাব দেয়।

কিন্তু এ কথা রাসু বিশ্বাস করিতে পারে না। গোপীর পা যে কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হইয়া যাইবে রাসুকে তাহা বিশ্বাস করাইতে এত বেশি আগ্রহ দেখায় কুবের যে রাসু সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠে।

হঠাৎ একদিন সে করে কি, চলিয়া যায় আমিনবাড়ি। হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে, বলে যে সে গোপীর আত্মীয় কোনো মতেই কি গোপীর পা'টি আগের মতো করিয়া দেওয়া যায় না? ডাক্তারের সামনে হাত জোড় করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ব্যাকুল, কত উৎকণ্ঠিত আত্মীয় সে গোপীর!

না, গোপীর দরদী আত্মীয়কে ভরসা ডাক্তার দিতে পারেন না! রাসু চিন্তিত মুখে গ্রামে আসে। আবার সে দেখিতে যায় গোপীকে। শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা, শীর্ণ রোগা মুখখানিতে জ্বলজ্বল করিতেছে দুটো চোখ, একটা খড়ের পুঁটলির উপর ভাঙা পা'টি রাখিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে বিছানায়।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রাসু মমতাবোধ করে। ময়নাদ্বীপে একে একে স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া যে নিষ্ঠুর বেদনায় বুক তাহার দীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তেমনব বেদনা লক্ষ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়াও আর সে কোন দিন অনুভব করিবে না গোপীর ভাঙা পা'খানা দেখিলে মনটা শুধু কেমন করিয়া ওঠে।

একদিন সকালে হোসেন মিয়া কুবেরের বাড়ি আসিল।

মৃদু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাম মিলে নাই কুবের বাই?'

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

হোসেন বলিল, 'জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, ক্যামনে ভালা করুম তোমাগো হুঁশ থুই কুবের বাই। কাম করবা আমার নায়?'

মনে মনে কুবের ভয় পাইল। কী মতলব করিয়াছে হোসেন মিয়া? যাচিয়া কাজ দিতে চায় কেন? হোসেন মিয়ার উপকার গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল নাই, কুবের তাহা ভাল করিয়াই জানে, কোন স্বার্থ সাধিবার জন্য কবে কাহাকে হোসেন মিয়ার প্রয়োজন হয় তাহাই শুধু কেহ জানিতে পারে না; কুবের এক বার ভাবিল, না, হোসেন মিয়ার নৌকায় সে কাজ করিবে না। কিন্তু এ কথা বলা যায় না। লোকটার মৃদু-হাসিভরা মুখের দিকে চাহিয়া যত ভয় করে কুবেরের, সেই ভয়ের তাড়নাতে ওকেই যেন জড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন তত বাড়ে। তাহা ছাড়া আজ পর্যন্ত ক্ষতি সে কিছুই তাহার করে নাই, বরং উপকার করিয়াছে সে অনেক।

কুবের জোর করিয়া আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ পাইলে সে বর্তিয়া যায়। সে যেন জানিত না কুবের রাজি হইবে, এমনভাবে হোসেন খুশি হইয়া গেল- মানুষ বশ করার কত কায়দাই লোকটা জানে! কী কাজ করিতে হইবে কুবেরকে, কী সে পাইবে এ সব কথা কিছুই উঠিল না। হোসেন শুধু বলিল, 'মাঝে মাঝে দশ-পনের দিনের জন্য কুবেরকে বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যাইতে হইবে পদ্মার দূরতম বন্দরে, যেখানে যেখানে হোসেন মিয়ার বাণিজ্য আছে।' কিসের বাণিজ্য হোসেন মিয়ার?

কে তাহা জানে? কে সে প্রশ্ন করিবে? কুবের শুধু সায় দিয়া গেল- তাহার আপত্তি নাই। সপরিবারে ময়নাদ্বীপে যাওয়া ছাড়া যেখানে যাইতে বলুক, কুবের সেইখানেই যাইবে, যা করিতে বলুক তাহাই করিবে। প্রতিদানে জীবিকা পাইলেই হইল।

গণেশের কথাটা কুবেরের মনে পড়িতেছিল, তাহার জন্য ধনঞ্জয়ের নৌকায় একা সে কাজ নেয় নাই। আজ গণেশকে ফেলিয়া হোসেন মিয়ার কাজ নেওয়া তাহার কি উচিত হইবে? কুবের উশখুশ করে। গণেশের কথাটা বলিতে গিয়া মুখে আটকাইয়া যায়। বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া যদি তাহার নিজের কাজটা ফসকাইয়া যায়? তাহা ছাড়া তাহার সঙ্গে গণেশও হোসেন মিয়ার খপ্পরে আসিয়া পড়িবে এটা কুবেরের ভাল লাগিতেছিল না।

তবু, গণেশেরও একটা উপায় হওয়া চাই।

ঢোক গিলিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল 'গণেশরে নিতে পারেন না হোসেন মিয়া? গণেশ বলবান, পাকা মাঝি গণেশ-বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বটে কিন্তু জেলেপাড়ায় ওর মত লগি ঠেলিতে, দাঁড় টানিতে আর কেহ পারে না।'

হোসেন বলিল, 'ডাইকা আনবা গণেশেরে?'

'অখন?'

'হ, যাও, বাতচিত কইরা যাই।'

কুবের অনিচ্ছার সঙ্গে উঠিয়া গেল। হোসেন মিয়াকে একা বাড়িতে রাখিয়া যাইতে তাহার ভরসা হয় না। গণেশকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, ইতিমধ্যেসংবাদ পাইয়া আমিনুদ্দি আসিয়া হোসেন মিয়ার কাছে বিসয়াছে। আমিনুদ্দিকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না কয়েক দিন আগে জহরের ছেলের সঙ্গে মেয়েটার সে বিবাহ দিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের অপমৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলে তাহাকে বারণ করিয়াছিল, কাহারো কথা শোনে নাই। যেটুকু বন্ধন ছিল তাহাও সে অধীর হইয়া চুকাইয়া পেলিয়াছে। এ বার সে কী করিবে সেই জানে!

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কুবেরকে দেখিয়া আমিনুদ্দি বলিল, 'ময়নাদ্বীপে যামু গিয়া কুবির, কাইজা মনে থুইও না, কসুর মাপ কইরো বাই।'

'ময়নাদ্বীপে যাবা? ক্যান?'

'কই যামু, নাতি?'

কুবের ও গণেশ অভিভূত হইয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া রহিল। সকলকে হারাইয়া রাসু এক দিন ময়নাদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এখানে আমিনুদ্দি সকলকে হারাইয়া ময়নাদ্বীপে যাইতেছে। আমিনুদ্দিকে ওখানে নেওয়ার জন্য হোসেন অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, এত দিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল-হোসেনের কোনো ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকিবার নয়? ভয়ে তাহারা হোসেন মিয়ার দিকে তাকাইতে পারে না। মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই গাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোনো কোনো মানুষের ভূত-প্রেতের উপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাহাই আছে কিনা কে জানে! একদিন রাত্রে সে যে হোসেন মিয়ার পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়াছিল সে কথা মনে করিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে থাকে। এমন অলৌকিক শক্তি যার, সে কি টের পায় নাই চুরির কথা? ঘরের চালা হয়তো নয়, হয়তো হোসেনের পোষমানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সে দিন গোপীর হাঁটু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, বাড়ি ছিল না বলিয়াই কুবের সে দিন বাঁচিয়া গিয়াছিল নিজে? মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারের মতো অতল কুসংস্কার নাড়া খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কুবেরের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

খানিক পরে আমিনুদ্দি উঠিয়া গেল। তখন হোসেন কুবের ও গণেশকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল ময়নাদ্বীপে গিয়া মঙ্গল হইবে আমিনুদ্দির, এখানে শোকে-দুঃখে কাতর হইয়া থাকিবে লোকটা, তাহার চেয়ে সেখানে গিয়া আবার বিবাহাদি করিয়া ঘর সংসার করা কি ভালো হইবে না ওর পক্ষে? ময়নাদ্বীপ কি সে রকম আছে এখন, জঙ্গল সাফ হইয়া এখন সেখানে নগর বসিয়াছে।

হোসেন মিয়া চলিয়া গেলে গণেশ ও কুবের বসিয়া অনেক ক্ষণ গল্প করিল। ভবিষ্যতের সব জল্পনা-কল্পনা। চাকরি পাইয়া দু জনেই খুশি হইয়াছে, দেনা-পাওনার ব্যাপারে হোসেন মিয়া কৃপণ নয়, কোথায় কোথায় যাইতে হইবে, লগি ঠেলা ছাড়া আর কী তাহাদের দিয়া হোসেন মিয়া করাইয়াই লইবে, এখন তাহাই শুধু তাহাদের ভাবনা।

কয়েক দিন পরে হোসেন মিয়ার আহ্বান আসিল।

কুবের ও গণেশ সকাল সকাল খাইয়া নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে হোসেন মিয়ার বড় একটি পানসি বাঁধা ছিল। নৌকায় আরও দু'জন মাঝি আছে, তাহারাও হিন্দু। হোসেন মিয়ার ব্যবস্থা ভালো, একই নৌকায় হিন্দু-মুসলমান মাঝি থাকিলে তাহাদের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা হয়, সে তাই তাহার তিনটি নৌকার দুটিতে শুধু মুসলমান রাখিয়াছে, আর এই নৌকাটিতে রাখিয়াছে হিন্দু মাঝি। দু'জনের নাম শম্ভু ও বগা।

তখন নদীতে কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল দেবীগঞ্জের দিকে। দেবীগঞ্জে হোসেন নামিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরিয়া আসিয়া কুবেরকে সে ডাকিল কাছে। বলিল, 'কলকাতা হইতে বিড়ির চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সেখানে গিরিধারী সাহার গদিতে খবর দিলে তাহারা মাল নামাইয়া লইয়া যাইবে, তারপর কুবের নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে কেতুপুরে। দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নৌকা কেতুপুরেই বাঁধা থাকিবে।'

সকলকে সঙ্গে করিয়া হোসেন রেলের মাল-গুদামে গেল। টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না, কুবেরের হাতে তিনটি টাকা দিয়া জেটিতে যে স্টিমারটি বাঁধা ছিল সোজাসুজি তাহাতে গিয়া উঠিল।

হোসেন মুখে বলিয়া যায় নাই, তবু কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে নাই যে সমস্ত ভার সে দিয়া গিয়াছে কুবেরকে, কুবেরই

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সব ব্যবস্থা করিবে। কুবের প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এ কী সম্মান তাহার, এ কী সৌভাগ্য! এত বড় একটা নৌকা, তিন জন জবরদস্ত মাঝি, তিন শ চার শ টাকার মাল- এ সমস্তের উপর কর্তৃত্বের অধিকার তাহার একার। সকলের রাহা খরচের টাকা পর্যন্ত হোসেন মিয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছে।

মাল তুলিতে বলিতে গিয়া কুবেরের মুখে কথা আটকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। হোসেন মিয়ার পক্ষপাতিত্বে না-জানি মনে মনে ওরা কত রাগিয়াছে!

তার পর কুবের নীরবে একটা প্যাকিং কেস তুলিয়া লইল। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল, 'জলপানি দিবা না কুবির?'

কুবের ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'মাল নায় তুইলা দিলে চলব না?'

তাহা চলিবে। ধীরে-সুস্থে তাহারা বিড়ির কেসগুলি নৌকায় তুলিতে লাগিল। কাজে কারো যেন গা নাই। কাজের চেয়ে কথা বলিয়া কুবেরের সঙ্গে খাতির জমাইবার চেষ্টাই তাহাদের বেশি। এক প্রস্থ মাল রাখিয়া আসিয়াই বগা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বসিল। ওদের দেখাদেখি গণেশও যেন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। কুবের মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

মাল বোঝাই হইলে কুবের চিড়া-গুড় কিনিয়া দিল সকলকে, বসিয়া বসিয়া এত আরামে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল যেন আজকের মতো কাজকর্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। নৌকা খুলিবার পরেও তাহাদের শৈথিল্য ঘুচিল না। এমনভাবে দাঁড় টানিতে লাগিল যেন কতকাল আগে তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

কুবের বলিল, 'গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।'

শম্ভু বলিল, 'ক্যান?'

কুবের সাহস করিয়া বলিল, 'ক্যান কী?' সারা দিন লাগাইয়া আমিনবাড়ি যাওনে? হোসেন মিয়া শুইনা কইব কী?

শম্ভু বলিল, 'হোসেন মিয়া শুনব ক্যান?'

বলিয়া শম্ভু হাসিল। দাঁড় উঁচু করিয়া রাখিয়া বুক চিতাইয়া বলিল, 'ডরাও নাকি হোসেন মিয়াকে কুবির, আঁই?'

কুবেরের পরিচয় এত ক্ষণে ওরা পাইয়া গিয়াছে, সর্দার বলিয়া আর মানিবে না, বন্ধুর মতো সমানভাবে কথা কহিবে। কুবের বড় বিমর্ষ হইয়া যায়। কত বড় পদটা হোসেন মিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে ইতিমধ্যে সে তাহার পদমর্যাদা হারাইয়া বসিল। প্রথম প্রথম যখন ওরা খাতির করিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিলে ভালো হইত! গণেশটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার সঙ্গে ইয়ার্কি জুড়িয়া দিয়াছে।

কড়া কথা বলিবে না কি? ভয় দেখাইবে? ওরা অবশ্যই চটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কী আসিয়া যায় তাহার! স্বয়ং হোসেন মিয়ার সে নির্বাচিত প্রতিনিধি! তবু জোর করিয়া কুবের কিছু বলিতে পারে না। যেটুকু সে বলে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, নৌকা অগ্রসর হয় মন্থর গতিতে।

আমিনবাড়ি পৌঁছিতে বিকাল হইয়া গেল। গিরিধারী সাহার দোকানে খবর দেওয়া হইল বটে কিন্তু সে দিন মাল খালাস করিতে কেহ আসিল না। রাত্রে হোটেলে খাইয়া কুবের নৌকায় শুইয়া রহিল, শম্ভু ও বগার সঙ্গে শহরে গিয়া গণেশ যে কোথায় রাত কাটাইয়া আসিল, সকালবেলা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানা গেল না, রহস্য করিয়া তিনজনে তাহারা হাসিতে লাগিল। মনে মনে বড় রাগিয়া গেল কুবের। এ কী তামাসা জুড়িয়াছে গণেশ তাহার সঙ্গে? আজীবন যে নির্ভরশীল বোকা লোকটা তাহার তোষামোদ করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গদোষে এক দিন সে এমনভাবে বিগড়াইয়া গেল?

একটু বেলায় দোকানের লোক আসিয়া মাল লইয়া গেল। কুবের অবিলম্বে নৌকা ছাড়িল। কেতুপুরের কাছাকাছি আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল ঘাটে হোসেন মিয়ার সবচেয়ে বড় নৌকাটি বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া কুবেরের মুখ শুকাইয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গেল। এত দেরি করার জন্য না জানি হোসেন মিয়া তাহাকে কী বলিবে। শম্ভু এবং বগাও হঠাৎ অত্যন্ত বাধ্য ও কর্মঠ হইয়া গেল। ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপঝপ, গতি বাড়িয়া গেল নৌকার।

হোসেন মিয়া নৌকার সামনে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, ছইয়ের মধ্যে জড়সড় বসিয়াছিল এক নগ্নদেহ বছর চল্লিশ বয়সের পুরুষ, দুটি মাঝবয়সী রমণী ও তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয়, একটি মুসলমান পরিবার। কুবের ওদের চিনিতে পারিল না। হোসেন মিয়ার আত্মীয়-স্বজন যে নয় সহজেই টের পাওয়া যায়, ময়লা ছেঁড়া কাপড় ওদের পরনে, শীর্ণ দেহে শুষ্ক মুখে দারিদ্র্যের সুপরিচিত ছাপ।

ভয়ে ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার দিকে তাকায়, কিন্তু হোসেন মিয়া এতটুকু বিরক্তির লক্ষণ দেখায় না, দাড়িতে হাত বুলাইয়া একবার শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'মাল খালাস দিছ?'

কুবের রসিদটা তাহার হাতে দেয়। তার পর এক টাকা দশ আনা ফিরাইয়া দিয়া বলে যে রাহা-খরচ বাবদ এক টাকা ছ আনা লাগিয়াছে। বলিয়া তাড়াতাড়ি হিসাবও সে দাখিল করিতে আরম্ভ করে। বেশি নয়, তিনটি টাকা হইতে দু আনা পয়সা মোটে সে চুরি করিয়াছে, তবু বুকের মধ্যে তাহার ঢিপঢিপ করিতে থাকে। হোসেন মৃদু-মৃদু হাসে, 'বসে রও বাই, হিসাব দিবানে পরে।'

সে দিন ছুটি।

পর দিন আবার পাড়ি দিতে হইবে।

এবার কাছাকাছি কোথাও নয়, একেবারে সেই চাঁদপুর ছাড়াইয়া মেঘনার মোহনার দিকে। গন্তব্যস্থানটি ঠিক কোথায় হোসেন ভাঙিয়া বলিল না। কুবেরের প্রশ্নে মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, ব্যস্ততা কিরে! চাঁদপুর গিয়া কুবের নোঙর ফেলুক, ঠিক সময় সেখানে হাজির হইয়া হোসেন স্বয়ং নৌকার ভার নিবে, বলিয়া দিবে কোন পথে চলিবে নৌকা, কোথায় গিয়া শেষ হইবে যাত্রার।

এবার মাল নয়, মানুষ যাত্রী। হোসেনের নৌকায় যে মুসলমান পরিবারটি আসিয়াছে, তাহারা।

কুবের ও গণেশ কত দিনে বাড়ি ফিরিতে পারিবে বলা যায় না। বাড়িতে খরচ দিয়া যাওয়ার জন্য হোসেন দুজনকে পাঁচটি করিয়া টাকা দিল।

বাড়ির পথে গণেশের সঙ্গে কুবের কথা বলিল না। বড় সে চটিয়াছে গণেশের উপর। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে চলে, এ কথা সে কথা বলে, কুবের নীরব হইয়া থাকে, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখে না। গণেশের কি না মোটা বুদ্ধি, কুবের যে রাগিয়াছে এটা সে টের পাইল একেবারে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া।

টের পাইবা মাত্র সে বিবর্ণ হইয়া বলিল, 'গোসা করছ নাকি কুবিরদা?'

কুবের বলিল, 'যা যা বাড়িত যা, বাজে বকস ক্যান?'

বলিয়া সে হন হন করিয়া আগাইয়া গেল। গণেশ ক্ষুধার তাড়নায় তখনকার মতো বাড়ি গেল বটে, ভাতটি খাইয়াই সে আবার হাজির হইল কুবেরের বাড়িতে। কুবের কথা কয় না, চাহিয়া দেখে না। গণেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তামাক সাজিয়া নিজে দুটো একটা টান দিয়াই কুবেরের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, 'ধর কুবিরদা।'

কুবের হুঁকা গ্রহণ করিল। তবু সে কথা বলিল না।

খানিক পরে চাঁদপুর যাত্রার কথা উঠিল। আড়াল ছাড়িয়া হাতের ভরে ঘষিয়া ঘষিয়া মালা এবার আসিল কাছে। মুসলমান পরিবারটিকে হোসেন মিয়া কোথায় লইয়া যাইবে অনুমান করিতে কাহারো বাকি থাকে নাই, কে জানে কোন গ্রাম হইতে ওদের হোসেন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কেহ কুপরামর্শ দিবে ভাবিয়া নৌকা হইতে ওদের সে গ্রামে নামিতে পর্যন্ত দেয় নাই। মানুষটি সহজ নয় হোসেন মিয়া! মরুক তাহাদের কী? তাহারা মাঝি, পয়সা দিয়া যে লগি ঠেলিতে বলিবে তাহারই হুকুম মানিয়া নৌকা

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ভাসাইবে পদ্মায়, মানুষ না মাল কী আছে নৌকায়, তাহাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

বিকালের দিকে গণেশের খোঁজে উলুপী আসিল, বলিল, যুগল আসিয়াছে। কী খবর যুগলের? সাত দিন পরে তাহার বিবাহ। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালির রূপসী কন্যাকে সে ঘরে আনিতেছে।

ভালো কথা। আনুক। কুবেরের কী? আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে। চার কুড়ি টাকার ভাগ্যই যদি তাহার থাকিবে, পরের নৌকায় মাছ ধরিয়া লগি ঠেলিয়া সে মরিবে কেন আজীবন!

উলুপী আপসোস করিয়া বলে যে কপাল গোপীর! একটা বছর সবুর সহিল না মেয়ের, ঠ্যাং ভাঙিয়া খোঁড়া হইয়া রহিল। কত পাপ করিয়াছিল আর জন্মে কে জানে?

কুবরে বলিল, 'ক্যান যুগইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে?'

উলুপী একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া বলিল, 'কেডা নিব খোঁড়া মাইয়ারে?'

কুবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উলুপীর দিকে চাহিল, কিছু বলিল না।

রাত্রে সে দিন হঠাৎ আবার গোপীর হাঁটু ব্যথা করিতে লাগিল; মেয়ে কি সহজে নিস্কৃতি দিবে সকলকে! ওর যে কুক্ষণে জন্ম হইয়াছিল। ভোর-ভোর কুবের যখন বাড়ির বাহির হইল, গোপী যাতনায় কাঁদিতেছে। বসিয়া থাকিবার উপায় কুবেরের ছিল না। বেলা হইলে তামাকপাতা আনিয়া গোপীর হাঁটুতে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়া, পথে গণেশকে হাঁক দিয়া বিরস চিত্তে সে নদীতীরে গেল।

তখনও হোসেন ঘাটে আসে নাই। শম্ভু ও বগা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া হাই তুলিতেছে! ছই-এর মধ্যে মুসলমান পরিবারটি তেমনি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। রাত্রে কি ওরা ঘুমায় নাই? আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আর একজন কে বসিয়া আছে

নৌকায়, কাপড়ের পুঁটুলিটা রাখিতে নৌকায় উঠিয়া কুবের তাহাকে চিনিতে পারিল। আমিনুদ্দি।

'আমাগো লগে যাইবা নাকি আমিনুদ্দি বাই?' কুবের জিজ্ঞাসা করিল।

'হ!'

'মাইয়া কান্দে না?'

আমিনুদ্দি সায় দিল 'হ। কান্দে।'

দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হইবে, নৌকায় দড়ি কাছি লগি ও দাঁড়গুলি কুবের পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তক্তা তুলিয়া ভিতরে কতখাডনি জল উঠিয়াছে মাপিল। কিছু জ্বালানি কাঠ, তামাক ও নারিকেলের ছোবড়া, চাল, ডাল, তেল, নুন, পিতলের দুটা হাঁড়ি, দুটা লোহার কড়াই, কয়েকখানা কাঁসি কাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এ সমস্তের তদারকও কুবের করিল। কুবেরের দায়িত্ব কি কম? এত বড় অভিযানের সে পরিচালক।

তদারক শেষ করিয়া কুবের আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, লক্ষ করিতে লাগিল ছই-এর ভিতরের পরিবারটিকে। কী মন-মরাই ওদের দেখাইতেছে সকালবেলার ম্লান আলোকে। কাহারো মুখে কথা নাই, কী যেন ভাবিতেছে সকলে, ভীত ও স্তব্ধ ছেলেমেয়েগুলির পর্যন্ত এতটুকু সাড়া নাই জীবনের! গ্রাম ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

খানিক দেখিয়া কুবের পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নাম কি মিয়া?'

সে মৃদুস্বরে বলিল, 'রসুল।'

'বাড়ি কই?'

'মালুর চর।'

কথা বলিতে তাহার ভালো লাগিতেছে না বুঝিতে পারিয়া কুবের চুপ করিয়া গেল।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হোসেন মিয়া আসিতে আসিতে চারি দিকে আলো হইয়া উঠিল। ততক্ষণে জেলেপাড়ার অনেকে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উলুপী আসিয়াছে কলসি কাঁখে, স্বামীকে বিদায় দিয়া সে কলসি ভরিয়া বাড়ি ফিরিবে। লখা ও চণ্ডী আসিয়াই কুবেরের কাছে একটি করিয়া পয়সা দাবি করিয়াছিল, না পাইয়া তাহারা মুখ গোঁজ করিয়া আছে, বিদায় নেয়ার সময়ে বাপের কাছে এতখানি নিষ্ঠুরতা তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। রাসুও আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছে। এমনিভাবে একদিন সকালবেলা সে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে রওনা হইয়াছিল। কিন্তু সে-কথা রাসুর বুঝি মনে নাই। নির্বিকার চিত্তে সে হোসেন মিয়ার নিকট বিড়ি চাহিয়া ধূমপান করে, যাচিয়া কুবেরকে বার বার শোনায় যে কুবেরের চিন্তার কারণ নাই, তাহার অনুপস্থিতির সময় সকলের দেখাশোনা সেই করিবে। করে ফিরবা মাঝি? ঠিক নাই? তা হোক, রাসু যখন গ্রামে রহিল, বাড়ির জন্য কিসের ভাবনা কুবেরের?

এবার নৌকা খুলিলেই হয়। কুবেরের পথ-খরচের জন্য টাকা দিয়া হোসেন নামিয়া গেল। টাকার পরিমাণটা কুবেরকে অবাক করিয়া দিল-কী দরাজ হাত হোসেন মিয়ার। ভয়ও কুবেরের হইল বৈ কি? অতগুলি টাকা সামলাইয়া রাখা, হিসাব করিয়া খরচ করা, সে বড় সহজ কর্মভোগ নয়। সবচেয়ে অস্বস্তির কথা, টাকাটা হাতে আসিবামাত্র তাহার ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিন টাকায় যদি দু আনা বাঁচানো যায় নিজের জন্য, চেষ্টা করিলে এতগুলি টাকা হইতে না-জানি কত বাঁচানো চলে! কাল হইতে এই কথাই সে থাকিয়া থাকিয়া ভাবিতেছিল বটে, ভাবিতেছিল কত টাকা হোসেন এবার হাতে দিবে-পথ-খরচের টাকাটা তাহার ছিল না এমন নয়। আজ টাকাটা পাইয়া সে খানিক ক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিল। এতখানি বিশ্বাস হোসেন তাহাকে করে? হোসেন মিয়ার মত মানুষকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া একটু গর্বও কুবেরের হয়। না লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।

কুবের তো জানিত না যে তিন টাকায় দুই আনার বেশি ফাঁকি দিবার সাহস তাহার নাই বলিয়াই হোসেন তাহাকে বিশ্বাস করে! কুবের পাঁচটা টাকা কোনোদিন চুরি করিতে পারিবে না। শুধু সাহসের অভাবে নয়, দু-আনার বেলায় যে বিবেক তাহার চুপ করিয়া থাকে পাঁচ টাকার বেলায় তাহাই গর্জন করিয়া উঠিবে।

টাকাগুলি কোমরে বাঁধিয়া কুবের লখা ও চণ্ডীর দিকে চাহিল! তার পর দুটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিল ছেলেদের দিকে। পয়সা দুটা কুড়াইয়া নিয়া দুজনে চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময় দেখা গেল আলুথালু বেশে একটি মেয়ে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নৌকার উপর আমিনুদ্দি চঞ্চল হইয়া উঠিল। হোসেন বলিল, নাও খোলো কুবির।

খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া শম্ভু হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। আমিনুদ্দির মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিতে লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপই দিয়া বসে। উলুপী ছাড়া ঘাটে কোনো স্ত্রীলোক নাই যে ওকে ধরিবে। উলুপী কলসি-কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দির মেয়েকে তাহার ছুঁইবার উপায় নাই। কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিবার সময় নয়। সে-ই মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল সে ফিরিয়া আসিবে, দু দিন পরে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে।

মৃদু-মৃদু বাতাস বহিতেছিল। শম্ভু ও বগা বাদাম তুলিয়া দিল। তারপর কেতুপুরের ঘাট দূর হইতে দূরে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবের আমিনুদ্দির কাছে আসিয়া বলিল, 'মাইয়ারে কইয়া আস নাই?'

দাঁড় বাহিবার প্রয়োজন ছিল না, আস্তে আস্তে বাতাসের জোর বাড়িয়াছে, বাদাম উঠিয়াছে ফুলিয়া। কুবের এ বারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজের রাজ্যপাট ও প্রজাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

দেখিতে লাগিল। রাজ্য প্রকাণ্ড, বসিবার, শুইবার, স্থানাভাব নাই, শুধু প্রজারা বড়ই অসুখী। মাঝবয়সী রমণীটি, পরিচয় পাইয়া কুবের জানিতে পারিল রসুলের সে বোন, যাত্রার আগেই মৃদুস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কত গ্রাম তাহারা পার হইয়া আসিয়াছে, এখনো থাকিয়া থাকিয়া সে চোখ মুছিতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে জলখাবার বণ্টন করিয়া দিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনটা খারাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরের। নদীকে সে বড় ভালোবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মতো সুখ আর নাই। একে একে কতকগুলি লঞ্চ ও স্টিমার দু দিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখের বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টিমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশে পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে-তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।

তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জল-স্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারা জীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য? কী তার প্রয়োজন? নূতন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?

সকালবেলা সু-বাতাস ছিল, তারপর বাতাস দিক পরিবর্তন করিল। বিশেষ কিছু অসুবিধা তাহাতে হইল না! দাঁড় টানিতে কোনো কষ্ট নাই। নদীর স্রোতেই নৌকা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে, ফিরিবার সময় উজান ঠেলিয়া আসিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বটে, এখন আরামের অন্ত নাই।

মধ্যাহ্নে নৌকা ভিড়াইয়া রান্নার আয়োজন করা হইল। দুইটি উনান খুঁড়িয়া দুইটি হাঁড়িতে চাপানো হইল ভাত, কাছের এক গ্রামে তরিতরকারি মিলিল। নিজেদের জন্য রাঁধিবার ভারটা কুবেরের উপরেই পড়িয়াছিল, অদূরে রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে কুবের মনে মনে একটু আপসোস করিল। ভাবিল, কী ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে? ডাঙার গ্রামে যারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের ধর্মের পার্থক্য থাকে, পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী। গণেশ, শম্ভু ও বগা সঙ্গে না থাকিলে কুবের তো নিজের জন্য রাঁধিতে বসিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকা চলিল। রাত্রি নটা-দশটার সময় একেবারে নদীর কিনারায় সুষুপ্ত একখানি গ্রামের পাশে সে দিনকার মতো স্থগিত করা হইল যাত্রা।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে পাওয়া গেল পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গম। নদী এখানে সাগরের মতোই পারাপারহীন। সন্ধ্যার দেরি নাই দেখিয়া কুবের সে দিন নৌকা বাঁধিল, এদিকে সে আগেও আসিয়াছে বটে কিন্তু নদী ভালো করিয়া চেনা নয়। সন্ধ্যার পর নৌকা চালাইতে সে সাহস করিল না।

পর দিন চাঁদপুরে নৌকা ভিড়িল।

ভালয় ভালয় এতখানি পথ আসিয়া কুবেরের মনে আনন্দ ধরে না। এবার হোসেন মিয়া আসিয়া পড়িলেই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। জাহাজ-ঘাটে স্টিমার ভিড়িলে কুবের গিয়া যাত্রীদের অবরোহণ পথটির মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। মোটঘাট লইয়া দেশ-বিদেশের কত নরনারী তাহার সামনে দিয়া রেল-স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়, কুবেরের উৎসুক দৃষ্টি অনুসন্ধান করে হোসেনকে। সমস্ত যাত্রী নামিয়া আসিবার পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে।

হোসেন আসিল তিন দিন পরে রাত্রের স্টিমারে।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে কুবের চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হোসেনকে দেখিবা মাত্র সমস্ত চাঞ্চল্য তাহার অন্তর্হিত হইয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গেল। নির্ভর নিশ্চিন্ত রহস্যময় সদানন্দ মানুষটির সাহচর্যে মুহূর্তে সকল উত্তেজনা জুড়াইয়া যায়- কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গর্ব, আগামী কর্তব্য সম্পাদনের দুর্ভাবনা, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ভালোয় ভালোয় কুবের চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিতে না পারিলেও কিছুই আসিয়া যাইত না বটে হোসেনের! মৃদু হাসিয়া সে বলিত দরিয়ায় ঢুবাইয়া আইছ নাও? ভালো করছ কুবির বাই।

হোসেন নৌকায় আসিয়া বসিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, ছই-এর মধ্যে নছিবন ও রসুলের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর হইতে চাহিতে লাগিল-হোসেনকে দেখিয়াই তাহারা ঘোমটা দিয়াছে।

মৃদু মৃদু হাসে হোসেন, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে, দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সকৌতুকে রসুলের ছ-বছরের মেয়েটাকে বিবিজান বলিয়া ডাকে। আমিনুদ্দি মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহাকে সে বহাল তবিয়তে ঘরের কাজ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, দুশমন বলিয়া গাল দিয়া সে নাকি কড়া কথা বলিয়াছে অনেক।

আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে। সে বলে, 'আল্লা জানে মিয়া, আর ফির‍্যা আমু না ভাবলি মনডা পোড়ায়।'

হোসেন বলে, 'ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইল্যা দিই তোমারে কাইল। খুশি না হলি ক্যান-যাবা?'

আমিনুদ্দি মাথা নাড়ে।

হোসেন বলে তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি?

আমিনুদ্দি বিস্মিত হইয়া বলে, 'কাইল ক্যান? ময়নাদ্বীপি দিবা-দুই মাস বাদ।'

হোসেন বলে, 'ময়নাদ্বীপে মোল্লা পামু কই? রাজাবাড়ির আজিজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শওজনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না দিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু

না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর-না মিয়া, আমার দ্বিপির মদ্যিও কাম চলব না।'

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনের মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনো শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ও দ্বীপটির জন্য তাহার কত দরদ। নীলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই-হাজার দেড়েক মানুষ চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনোখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে! ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়লোক-একসঙ্গে তাহার নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়লোক-এক সঙ্গে তাহার এতগুলি লাভবান ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণার পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেয়। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে?

'কী কও রসুল, নিকা সারি কাইল?'

রসুল সায় দিয়া বলে, 'আমি কী কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।'

হোসেন বলে, 'বইন কী কয় জিগাও।'

রসুল ছই-এর মধ্যে গিয়া খানিক পরামর্শ করিয়া আসে। নছিবনের মত আছে। আমিনুদ্দি নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। আপন মনে কী যেন ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোক-মালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর! যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে-প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি। হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মতো জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, হতাশ ও নিরুৎসাহ

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অনেক রাত্রে হোসেন বিদায় গ্রহণ করিল। নৌকায় তখন জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া যাওয়ার পর আমিনুদ্দির সঙ্গে সকলে হাস্য-পরিহাস জুড়িয়া দিল। ঠাট্টা করিতে বড় মজবুত শম্ভু। তাহার এক-একটা কথায় নৌকায় হাসির কলরব উঠিতে লাগিল, ছই-এর মধ্যে রমণী দুটি পর্যন্ত মাঝে মাঝে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় চাপা দিতে লাগিল।

পরদিন আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের নিকা হইয়া গেল। তাহার পরের দিন কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতি, তিন-চার বস্তা আলু, এক পিপা সরিষার তৈল, কাঠের একটা বাক্স-বোঝাই নুন, কতকগুলি সস্তা বিলাতী কম্বল, এক বস্তা কাপড়জামা এসব অজস্র জিনিস পত্রে হোসেন নৌকা বোঝাই করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে বলিল, 'নাও খোলো কুবির বাই।'

'কোন দিক যামু মিয়া বাই।'

হোসেন বলিল, 'সমুন্দুর!'

সারাদিন এই তীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিল। কেতুপুরের পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরদিন অপরাহ্নে নোয়াখালি জেলার নারিকেল বৃক্ষপূর্ণ তীর-ভূমিতে নৌকা বাঁধা হইল। এদিকে কুবের কখনো আসে নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কি সমুন্দর?' হোসেন একখানা ম্যাপ বাহির করিল। আঙুল দিয়া সে কুবেরকে চিনাইয়া দিতে লাগিল মেঘনার মোহনার দ্বীপগুলি-সিদ্ধিদ্বীপ, বিদৌদ্বীপ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া প্রভৃতি। আরও পশ্চিমে মানপুরদ্বীপ, দক্ষিণ শাবাজপুর, বন্দোরাদ্বীপ। আর ওই যে ছোট ছোট বিন্দুগুলি দেখা যায় বাইশ

নম্বর মোটা লাইনটার উপরে, ওগুলি মাকি-দ্বীপপুঞ্জ। চিনিতে পারিতেছে কুবের। আর ও পূর্ব-পশ্চিমের বাইশ নম্বর লাইন আর উত্তর-দক্ষিণের একানব্বই নম্বর লাইনটা যে বিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়াছে, এই বিন্দুটার কিছু উত্তর-পূর্বে ওই যে একটি সবুজ বিন্দু দেখা যায়, ওর নাম ময়নাদ্বীপ। আর ঘণ্টা দশেক নৌকা বাহিয়া তাহারা নোয়াখালির তীর-ভূমিকে পিছনে ফেলিবে, তারপর হাতিয়া ডাইনে রাখিয়া ধনমানিকদ্বীপ ছুঁইয়া, ধনমানিকদ্বীপ আর বাবনাবাদ দ্বীপের যোগরেখার সঙ্গে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি কোণ করিয়া পূর্ব-দক্ষিণে নৌকা বাহিয়া একদিনে ময়নাদ্বীপ পৌঁছানো যাইবে।

কুরের ভালো বুঝিতে পারে না। হা করিয়া নকশাররেখা ও লেখাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। কে জানে ওর মধ্যে ডাঙ্গা ও জলের পার্থক্য কী কৌশলে আঁকা আছে, সে তো কোনো প্রভেদ বুঝিতে পারে না।

হোসেন মিয়া যে কত বড় দক্ষ নাবিক, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই বোঝা গেল। সামনে একটা কম্পাস রাখিয়া সে হাল ধরিয়া বসিল, নৌকার ছয় জন মাঝি টানিতে লাগিল দাঁড়। সারাদিন পরে রক্তিম সূর্য সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল, পূর্বে বহুদূরে কালো বিন্দুর মতো একটি দ্বীপ ছাড়া সূর্য শুধু দেখাইয়া গেল আকাশ ও জলরাশি। রাত্রেও দাঁড় টানার বিরাম হইল না, পালা করিয়া দুজন দুজন মাঝিকে দু-ঘণ্টা করিয়া ঘুমানোর অবসর দিয়া চার জনকে হোসেন সব সময়ে বসাইয়া রাখিল দাঁড়ে, নিজে এক মিনিটের জন্যও চোখ বুজিল না। নৌকার সকলে হয়রান হইয়া গেল, কুবেরের মনে হইতে লাগিল, নৌকা বাহিয়া জীবনে সে আর কোনো দিন এত শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই।

সকাল বেলা দেখা গেল চারিদিক নিবিড় কুয়াশায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

হোসেন বলিল, 'বৈঠা থোও কুবির, নোঙর ফেলো।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

এতখানি কাছি টানিয়া নোঙর সমুদ্রের তলে গিয়া ঠেকিল যে কুবেরের মনে হইল নোঙরটা পাতালে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কুয়াশায় নৌকা চালাইবার উপায় নাই, ধনমানিক দ্বীপের কাছাকাছি তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, কুয়াশায় দেখিতে না পাইয়া পাশ কাটাইয়া দূরে চলিয়া গেলে বিপদ হইবে। এই দ্বীপটির অবস্থান দেখিয়া তবে ঠিক করা যাইবে বাবনাবাদ দ্বীপের সঙ্গে ইহার যোগরেখা, তারপর সোজা আগানো চলিবে কম্পাসের উপর নির্ভর করিয়া একেবারে ময়নাদ্বীপের দিকে। সারাদিন নৌকার অবস্থান বুঝিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। অপেক্ষা করিতে হইবে রাত্রির জন্য। রাতে তারা উঠিলে ওই যে অদ্ভুত যন্ত্রটা আছে হোসেনের, ওই যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তবে হোসেন বলিতে পারিবে কোন দিকে কত দূরে ধনমানিক দ্বীপ লুকাইয়া আছে।

কী জান মিয়া, কলের জাহাজ হলি, জানন যায় কত জোর চলতেছি, ঘণ্টায় কত মাইল আলাম-সমুন্দুরের কোনখানে রইছিল হিসাব করলি মেলে। নাও চাইয়া জানুম কি বা? দাড়িতে হাত বুলায় হোসেন, সকলকে অভয় দিয়া আবার বলে, 'ডরাইও না দশ বাজলি কুয়াশা থাকব না। আইজ-কাইল রোজ বিহান-বেলা কুয়াশা হয়। অ্যারে কি কুয়াশা কয় মাঝি?'

বসিয়া বসিয়া হোসেন গল্প বলে, সকলে শোনে! এ যেন কেতুপুরের এক ভাঙা কুটিরে হোসেনের আড্ডা বসিয়াছে। এমনি কুয়াশার মধ্যে একবার সে সমুদ্রের বুকে হারাইয়া গিয়াছিল, তিনদিন নোঙর ফেলিয়াছিল সমুদ্রে, জল ফুরাইয়া গিয়া শেষের দিন তৃষ্ণায় ছাতি তাহাদের ফাটিয়া গিয়াছিল। তারপর হোসেন কম্পাস কিনিয়াছে, তারা দেখিয়া নৌকার অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র কিনিয়াছে, চাটগাঁয়ে হোসেন যখন জাহাজে কাজ করিত, খালাসির কাজ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত একটা মালবাহী স্টিমারের কাপ্তান পর্যন্ত সে হইয়াছিল, সেই সময়ে এক সাহেব কাপ্তানের কাছে এসব যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। বড় বড় জাহাজ চালাইয়া হোসেন পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে!

পৃথিবী সে কি ঘুরিয়া আসে নাই? হাঁ, সে কাহিনী বলিবার মতো বটে। কুড়ি বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছিল, তারপর অর্ধেক জীবন সে তো দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছে- নদীর বুকে ও সমুদ্রে।

অনেক বেলায় আস্তে আস্তে কুয়াশা মিশাইয়া গেল। নোঙর তোলা হইল। দু ঘণ্টা পরে দূরে দেখা গেল ধনমানিক দ্বীপ। কম্পাসটা সামনে রাখিয়া হোসেন ধরিয়া বসিল, পরদিন ভোরবেলা তাহারা ময়নাদ্বীপে পৌঁছিয়া নোঙর ফেলিল।

এই ময়নাদ্বীপ? পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া যে রহস্য-নিকেতনের কথা শুনিয়া আসিয়াছে? কুবের যেন একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে দ্বীপটিকে দেখিয়া ফেলিতে চায়। দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগার মাইল- হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপে যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সে দিকে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি এক স্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন, বোঝা যায় না।

জমি অত্যন্ত নিচু, এত নিচু যে আশঙ্কা হয় যে দিন খুশি হইবে সেই দিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নিচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে। জলার ধারে খানিকটা ধানের জমি করা হইয়াছে, বিস্ময়কর ফসল ফলে। জলায় ও চারিদিকে জঙ্গলে অসংখ্য সাপ আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার কিছু নেই, রাসু যে বাঘ-সিংহের গল্প করিয়াছিল -সেটা নিছকই গল্পই।

হোসেন মিয়ার উপনিবেশে লোকসংখ্যা একশ'র কম নয়, কিন্তু তাহার তিন ভাগই প্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যাহাদের অধিকাংশই এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করিয়া এখনো হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে। অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব। রাসুর মতো অনেকে তাই পলাইয়া গিয়াছে। হোসেনের পাঁচ বছরের চেষ্টায় দ্বীপে তাই ত্রিশটির বেশি পরিবার নীড় বাঁধে নাই। আমিনুদ্দি ও রসুলকে ধরিলে দ্বীপে গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা এবার বত্রিশ হইল মাত্র।

কী কঠিন কাজে হোসেন মিয়া যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কী সীমাহীন যে তাহার ধৈর্য ও অধ্যবসায়, এবার কুবের তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে । এই নিচু জলা ও জঙ্গলপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য দ্বীপ, ধান ছাড়া আর কোনো ফসল যে দ্বীপের লোনা মাটিতে জন্মে না, লাউ-কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মতো ছোট ছোট- এখানে এই মুষ্টিমেয় নরনারীর বসতি স্থাপন করাও হোসেন মিয়া ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হইত না। সন্দীপ, হাতিয়া, ধনমানিক, বাবনাবাদ এই সব জনপূর্ণ দ্বীপের কথা কুবের শুনিয়াছে, ময়নাদ্বীপ যদি মানুষের বাসের হইত, ওই সব দ্বীপের মতো করে এখানে গড়িয়া উঠিত গ্রাম। এ কী কদর্য একট দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে?

হয়তো সস্তায় পাইয়াছিল বলিয়া। স্বাস্থ্যকর, উর্বর দ্বীপ কিনিয়া জমিদারি পত্তনের টাকা হোসেন কোথায় পাইত? ও রকম জনহীন দ্বীপই বা কোথায়?

দ্বীপ দেখিয়া আমিনুদ্দি ও রসুল বড় দমিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যাওয়ার কথাটাও তাহাদের মুখে শোনা গিয়াছে দু-একবার। তবে হোসেনের সামনে তাহারা কিছুই বলে না। বলা যায় না। কত উপকার যে হোসেন তাহাদের করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না। আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়, হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত-নছিবনের মতো স্ত্রী? রসুলকে জেলের দুয়ার হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিয়াছে হোসেন,

দেশে ফিরিলে জেলেই হয়তো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাহাদের কাছে চায় না, তাহারা শুধু এখানে বাস করুক, স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের। ইতিমধ্যে তাহাদের জন্য ঘর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, দয়া করিয়া ওই ঘরে তাহারা নীড় বাঁধিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে হোসেন। জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তাহারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে সব তাহাদের সম্পত্তি, খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবি করিবে না। নিজের জীবিকা তাহারা যত দিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত যোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?

হোসেনের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কথা তাই কেহ মুখে আনিতে পারে না। ফিরিয়া যে যায় সে যায় পলাইয়া চোরের মতো।

হোসেন তাহাদের ক্ষমা করে। দেখা হইলে রাসুর মতো হোসেন তাহাদের জঙ্গল সাফ করার মজুরি দেয়। জোরজবরদস্তি হোসেনের নাই, অন্যায় সে কারো প্রতি করে না। শুধু তাহাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যে শত্রুতা করে হোসেনের স্বপ্ন সফল হইবার পথে।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপের মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল। ক্ষেতের ধান সব কাটা হইয়া গিয়াছে, কিছু সরিষা, বুট ও মটর লাগানো হইয়াছে। মূলা, পালং, কপি প্রভৃতি শাক সবজি গত বছর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে নাই, এ বছর কয়েক বিঘা জমিতে নূতন এক প্রকার সার দিয়া পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু চাষ হইয়াছে, কী হইবে বলা যায় না।

আরও ভিতরের দিকে দ্বীপের মাটি রবিশস্যের উপযোগী কি না দেখিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে এখন অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করা হইতেছে। সকালবেলা দা কুড়াল লইয়া একদল লোক জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক হাঁটিয়া যায়, নির্বাচিত স্থানটিতে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গাছপালা ঝোপঝাড় কাটিয়া সাফ করে, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া গাছের শিকড় তুলিয়া ফেলে, তারপর সারা দিন মশা ও পোকার কামড়ে শরীর ফুলাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। কুবের একদিন দেখিতে গিয়া শিহরিয়া ফিরিয়া আসিল। এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তাহার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারি পাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিস্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়।

কয়েক দিন আগে কী একটা গোলমাল হইয়াছিল দ্বীপে, হোসেন উপস্থিত না থাকিলে অনেকে একত্র হইয়া জটলা করে, ভাসা-ভাসা দুটো একটা কথা কানে আসে কুবেরের। বিপিন নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে হোসেন এখানে মোড়ল করিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়াই জটলাটা জমাট বাঁধে বেশি, কুবের কাছে গেলেই কিন্তু সকলে চুপ করিয়া যায়। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম শেষ করিয়া সকলে যখন ঘরে ফিরিয়াছে, নিজের স্বতন্ত্র কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া হোসেন প্রসন্ন মুখে টানিতেছে তামাক, বিপিন কথাটা ফাঁস করিল। বলিল, 'নালিশ আছে একটা।'

'নালিশ?' হোসেনের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপিন ধীরে ধীরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। নারী-সংক্রান্ত লজ্জাকর ঘটনা। এনায়েত দ্বীপে আসিয়াছে মাত্র ছ মাস আগে, ইতিমধ্যে সে সকলকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম এর সঙ্গে ওর সঙ্গে প্রায় তাহার কলহ বাঁধিত, একদিন নিরীহ দুর্বল গগন ঘোষকে মারিয়া জখম করিয়া দেয়, সকলে মিলিয়া তখন খুব শাসন করিয়া দেয় এনায়েতকে। তারপর হইতে সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া থাকে, ব্যাপারটা তাই হোসেনকে জানানো হয় নাই। কিন্তু ক দিন আগে সে এক ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। বসির মিয়ার বৌটি ছেলেমানুষ, কিছুদিন হইতে এনায়েত তাহাকে নাকি বিরক্ত করিতেছিল, ভয়ে বৌটি কাহাকেও কিছু বলে নাই। তারপর একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়াছে, এনায়েত বসিরের ঘরে প্রবেশ করে। বসিরের স্ত্রীর

চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের কুটিরের আকবরের স্ত্রী গিয়া পড়ায় বেচারা সে দিন ভালোয় ভালোয় রক্ষা পাইয়াছে।

হোসেন বলিল, 'হারামির পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?'

বিপিন স্বীকার করিল, অতটা তাহারা করিতে পারে নাই, তবে মারধোর করা হইয়াছে যথেষ্ট। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সকলকে হোসেন ডাকিয়া আনিতে বলিল, এনায়েতও যেন আসে। অল্প ক্ষণের মধ্যে সকলে আসিয়া জুটিল, মেয়েরাও কেহ কেহ আসিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল কৌতুহলের সঙ্গে। বিচার হইবে এনায়েতের। কে জানে তাহাকে শূলেই দিবে, না সাগরে ডুবাইয়া মারিবে হোসেন।

এনায়েতের বয়স বেশি নয়, বলিষ্ঠযুবক সে, ময়নাদ্বীপে এমন আর একটা মানুষও নাই। তেজের সঙ্গে সে আসিয়া হোসেনের সামনে বসিল, নির্ভয় নিশ্চিন্তে। হোসেন একে একে দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, রুষ্ট চোখে এনায়েতের দিকে চাহিতে লাগিল, বার বার বলিতে লাগিল কী আপসোস! কী আপসোস!

তারপর সে কৈফিয়ত তলব করিল এনায়েতের।

এনায়েত বলিল, 'জবরদস্তি করি নাই মিয়া।'

হোসেন বলিল, 'না করলা জবরদস্তি,বসিরের ঘরের মদ্যি যাবা ক্যান তুমি? কবিলারে নজর দিবা ক্যান?'

'আমারে দেইখ্যা এক রোজ স্যায় হাসিল!'

'আরে বলদা তুমি! ভালো কাম কর নাই মিয়া। তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খানাপিনা মিলব না।'

তখন হোসেন মিয়ার হুকুমে সকলে মিলিয়া তাহাকে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। আলগা করিয়া বাঁধিল, হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন তো এ দ্বীপে জোরালো নয় । বাঁধন খুলিয়া পালানোর সাহস এনায়েতের হইবে না। কোথায় পালাইবে?

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হোসেনের ঘরের কাছেই একখানা ঘরে কুবের ও তাহার সঙ্গীদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সে দিন অনেক রাত্রে বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে কুবের দেখিতে পাইল, হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েত থালায় ভাত খাইতেছে, কাছে বসিয়া আছে একটি রমণী। চুপি চুপি কুবের ঘুরিয়া হোসেনের ঘরের পিছনের দিকে গেল, জানালা দিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল।

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, 'হ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।'

বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

এত বড় একটা ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া হোসেনের পাশ ফিরিয়া শোয়া অবাক করিয়া দিল কুবেরকে আজ, ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল দ্বীপ ছাড়িয়া ফিরিবার দিন। বুড়া বসির নৌকায় আসিয়া উঠিল তাহার ছেলেমানুষ বৌ রহিয়া গেল দ্বীপে। বসির এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা, প্রায় পাঁচ বছর এখানে সস্ত্রীক বাস করিতেছে। ছেলেমেয়ে হয় নাই বসিরের-একটিও নয়। পাঁচ বছরে যে একটি মানুষ বাড়াইতে পারিল না দ্বীপের,কয়েক বছরের মধ্যে যে প্রবেশ করিবে কবরে, তাহাকে দিয়া আর কী প্রয়োজন আছে হোসেনের? বসির এবার তালাক দিবে তাহার বৌকে। তারপর যথাসময়ে এনায়েতের সঙ্গে নিকা হইবে বৌটির। একটি বৌ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে আনকোরা নতুন মানুষ-ময়নাদ্বীপের এক টুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও আরও একটা হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দু জনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছরে যে রমণী জননী হইতে পারে নাই, তাহার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।

গ্রাম ছাড়িবার তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। চাঁদপুরে তাহাদের নামাইয়া দিয়া হোসেন নৌকা

লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হোসেনের মুসলমান মাঝিরা চাঁদপুরে অপেক্ষা করিতেছিল।

গোপীকে নিয়া ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কুবের যে দিন চলিয়া গেল সেই দিনই গোপীর পা ভয়ানক ফুলিয়া উঠে। বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই, কী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তারপর রাসু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছে। কত যে করিয়াছে রাসু গোপীর জন্য, শত মুখেও মালা তাহা শেষ করিতে পারিবে না। সেই দিনই গোপীকে রাসু আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিয়া গিয়াছিল, রাত্রেই গোপীর হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়। সে এখনো হাসপাতালে আছে, প্রায়ই রাসু তাহাকে দেখিতে যায়। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছে, হাড় ভাঙ্গিয়া মাংসপেশীর জট ছাড়াইয়া গোপীর হাঁটু এবার ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটু খোঁড়াইলেও হাঁটিতে পারিবে।

কুবের ফিরিয়াছে খবর পাইয়া রাসু আসে। কুবের দুটা-একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেই সে একেবারে গলিয়া যায়। মাথাটা একবার চুলকাইয়া রাসু কয়েকটা ঢোক গেলে। তারপর হঠাৎ বলিয়া বসে, 'গোপীকে দিবা মাঝি আমারে।'

কুবের গম্ভীর হইয়া যায়। বলে, ব্যস্ততা কিসের? গোপী তো পড়িয়া আছে হাসপাতালে, আগে ফিরিয়া আসুক।' রাসু তবু পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গোপীর পা ভালো হইয়া যাইবে শুনিয়া অবধি সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় কুবেরের কাছে কথা আদায় করিয়া না রাখিলে পরে হয়তো যে মত বদলাইয়া ফেলিবে। গোপীর পঙ্গুতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল তখন কথাটা পাকাপাকি করিয়া নেয় নাই বলিয়া এখন বড় অনুতাপ হইয়াছে রাসুর।

শেষে কুবের বলিল, 'কাইল কমু রাসু।'

রাত্রে সে পরামর্শ করিল মালার সঙ্গে। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, রাসু যদি দেড় কুড়ি টাকা পণ দেয় আর দু কুড়ি টাকার

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গহনা দেয় গোপীকে তবে এ বিবাহ হইতে পারে। তাহার কমে হইবে না।

পর দিন রাসু আসিল। কুবেরের দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল। বলিল, 'অত টাকা কই পামু?'

কুবের তাহার কী জানে? এই কটা টাকা যদি সে বিবাহে খরচ করিতে না পারে, বিবাহের পর বৌকে তবে সে খাওয়াইবে কোথা হইতে?

রাসু মাথা নিচু করিয়া থাকে। মালা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি মমতাবোধ করে, কুবেরকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া ফিস ফিস করিয়া টাকার পরিমাণটা কিছু কমাইতে বলিয়া দেয়। কিন্তু মেয়েমানুষের পরামর্শে ভুলিবার পাত্র কুবের নয়। গম্ভীর অবিচলিত মুখে সে বসিয়া থাকে বেড়ায় ঠেস দিয়া, চক্ষু মুদিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

অনেক ক্ষণ পরে রাসু বলে, 'আইচ্ছা দিমু।'

বলিয়া সে উঠিয়া যাইতে চায় কিন্তু কুবের এবার তাহাকে খাতির করিয়া বসায়, আগ্রহ সহকারে গল্প জুড়িয়া দেয় ময়নাদ্বীপের। রাসুর না জাগে উৎসাহ, না আসে মুখরতা।

কী হইল রাসুর? এত দিনের স্বপ্ন তাহার সফল হইবে জানিয়া আহ্লাদ হইল না কেন? তামাক সাজিয়া খানিক ক্ষণ টানিয়া হুঁকোটি নামাইয়া রাখিয়া কুবের আড়ালে যায়। ক দিন আগেও তাহারা হুঁকা কাড়াকাড়ি করিয়া তামাক টানিয়াছে কিন্তু এখন কি না রাসু তাহার ভাবী জামাতা, ওর হাতে এখন হুঁকা দেওয়া যায় না, ওর তামাক খাওয়ার সময় সামনে থাকা যায় না।

দিন তিনেক পর কুবের আমিনবাড়ি গিয়া গোপীকে দেখিয়া আসিল। হাসপাতালের খাবার খাইয়া বিছানায় শুইয়াই গোপী দিব্যি মোটাসোটা হইয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য রঙের যেন তাহার খোলতাই হইয়াছে বেশ। দিন সাতেক পরে সে ছুটি পাইবে।

রীতিমতো শীত পড়িয়াছে এখন। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ার শরীর রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালার চামড়া কিন্তু চিরদিন মসৃণ, হাজার শীতেও কখনো তাহার গা ফাটে না। কপিলারও বুঝি ফাটে না। যে তেলটাই কপিলা খরচ করে শরীরের পিছনে! মাঠে পালং শাকের পাতাগুলিতে যে সরল লাবণ্য ফুটিয়া আছে, কপিলার দেহে হয়তো তাহার অভাব নাই। মালার বোন তো সে! মালার চেয়ে সে হাজার গুণে সৌখিন।

কাজ-কর্ম নাই, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কুবের সময় কাটায়। পীতম মাঝির অসুখ হইয়াছে। বুড়ো বয়সে তাহার সেবা করিবার কেহ নাই, যুগী তাই আসিয়া বাপের কাছে আছে। পীতম সেবা গ্রহণ করে মেয়ের কিন্তু দিবারাত্রি তাহাকে গাল দিয়া কিছু রাখে না। যুগীর হাতে জল খাইয়া চিরদিন নরকে পচিবার সাধ যে তাহার নাই, সব সময় এই কথাটা সে ঘোষণা করিতে করিতে গলা কাঠ হইয়া আসিলে যুগীর দেওয়া জল খাইয়াই তৃষ্ণা মেটায়। পীতমের টাকা আছে অনেক। বলে, টাকার লোভে যুগী তাহার সেবা করিতে আসিয়াছে কিন্তু একটি পয়সা সে যুগীকে দিয়া যাইবে না। যা কিছু তাহার আছে সব সে কালই বাবুদের জিম্মা করিয়া দিবে, তাহার পলাতক ছেলেটা আসিলে সে পাইবে। ছেলেটা পীতমের ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

রাসু একবার পীতমকে দেখিতে আসিয়াছিল, পীতম তাহাকে দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিয়াছে। রাতারাতি খুন করিয়া ময়নাদ্বীপ-ফেরত ডাকাতটা যে তাহার সর্বস্ব লইবে অত বোকা পীতম নয়। রাসু কাছে আসিলে সে তাহার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিবে। শীর্ণ হাত দুটি উঁচু করিতেও পীতমের কষ্ট হয়, রাসুর ঠ্যাং সে কেমন করিয়া খোঁড়া করিবে সে-ই জানে।

কুবেরের কাছে রাসু মনোবেদনা জানায়। একমাত্র ভাগ্নে সে পীতমের, তাহাকে পীতম ত্যাজ্য করিয়া দিল! কত দুঃখ-কষ্ট পাইয়া সে ফিরিয়া আসিল ময়নাদ্বীপ হইতে, দু দিন বাড়িতে ঠাঁই দিল না, অম্লান বদনে খেদাইয়া দিল রাস্তায়। মরিবার সময়

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

এখন কাছে থাকিয়া একটু সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতেও বুড়া তাহাকে সন্দেহ করিবে, বাড়িতে ঢুকিতে দিবে না? তাহাছাড়া নিজের ভাগ্নে, সে পীতমের, বুড়ার টাকা-পয়সা বাড়ি-ঘরের একটা অংশ কি তাহার পাওয়া উচিত নয়? কাকে ওসব দিয়া যাইবে বুড়া?

কুবের বলে, 'পোলার লাইগা থুইয়া যাইব কয়।'

রাসু বলে, 'পোলা'! বাঁইচা আছে নাকি স্যায়! গাঙে ডুইবা গেছে গা কবে! আলস্যে সময় কাটায় কুবের, গ্রামে জোয়ান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হইয়া যায়, গ্রামে থাকে শুধু বুড়া, শিশু ও নারীর দল, কুবের শুধু শুনিতে পায় পাকা মুখের আপসোস আর নরম গলার কলহ।

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সময় কাটায় কুবের, মনটা তাহার ভালো নাই। জগা মাঝির বৌ যেন কপিলার অনুকরণ করিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, ভিজা কাপড়ে পথ চলিতে চলিতে চমকাইয়া উঠিয়া পেছনে কুবেরকে দেখিয়া তাহার চোখে সন্দেহ ঘনাইয়া আসার আগে কুবেরের তো অন্যমনস্কতা ঘোচে না। অপ্রতিভ হইতে হয় কুবেরকে। নকুলের বাড়ির সামনে কুল গাছটার তলে একদিন কপিলার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছিল। মিছা কথা, কাঁটা বিঁধে নাই। উঃ, বলিয়া কুবেরকে জড়াইয়া ধরিবার ছল সেটা কপিলার। কেতুপুরে দুর্গা প্রতিমা দেখিয়া ফিরিবার সময় সে দিন কি ছলনাময়ীই কপিলা হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপীকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর-ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রাম-হাঁটা পথে বার-তের মাইল। ক্ষেতের আল দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতে চলিতে কত বার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুর পৌঁছাইয়া একটা পুকুরে মুখহাত ধুইতে নামিয়া কত বার সে যে পুকুরঘাট হইতে সোজা আবার আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তাহার হিসাব নাই।

তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইল তাহার।

শ্যামাদাস মাঠে গিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাদাসের মা-বোন-ঘরবাড়ি জুড়িয়া আছে, কপিলা এখানে ঘোমটা-টানা বৌ। কুটুম্বকে শ্যামাদাসের মা খাতির করিয়া বসিতে দিল, কুশল ও এদিকে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামাদাসের বাড়ি-ঘর দেখিয়া কুবের মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালোরকম জবাব দিতে পারিল না। চার ভিটায় চারিখানা বড় বড় ঘর শ্যামাদাসের, চারি দিকে লেপাপোছা ঝকঝকে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে কত জিনিস চোখে পড়ে, কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসন-কোসন-কত কিছু। উঠানের এক পাশে ধানের মরাই, অপর পাশে গোয়ালঘর। লক্ষ্মীশ্রী-মাখানো সম্পন্ন গৃহস্থের ঘর-সংসার, কুবেরের ভাঙা কুটিরের তুলনায় বৈকুণ্ঠপুরী। বুকের ভিতরে টাটায় কুবেরের। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী গিয়া তাহার ভাঙাঘরে শাকান্ন খাইয়া কটা দিন কাটাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম রচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পড়িয়া রহিয়াছে কেতুপুরে তাহার সেই নোংরা নীড়টিতে। কী বোকাই কুবের ছিল!

কপিলা জিজ্ঞাসা করে, 'খবর কী মাঝি? কী মনে কইরা আইলা? ভালানি আছে পোলাপানরা?'

ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মত। কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে। নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।

কয়েক মিনিট সাধারণ কথাবার্তা বলিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। আরও খানিক ক্ষণ আলাপ করিয়া কপিলার শাশুড়িও প্রস্থান করে। বাড়ির দু একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে কুবেরের কাছে, তারপর তাহারাও চলিয়া যায়। কুবের বসিয়া থাকে একা।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বোকা, নোংরা অপদার্থ কুবের। ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিরের কথা কুবেরের মনে পড়ে, মনে পড়ে, জ্যোৎস্নালোকে হোসেনের কুটিরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েতের ভাত খাওয়া, যাহার জন্য দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে ক বার সে মার খাইয়াছে, তাহারই আনিয়া দেওয়া ভাত। হোসেনের কল্যাণে ক দিন পরে মিলনও তাহাদের হইবে-প্রকাশ্য, সামাজিক, আইনসঙ্গত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়া এক-একটা লোক জন্মায় জগতে! বসিয়া থাকিতে পথ চলার শ্রান্তিতে ঢুল আসে কুবেরের। আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশ-কুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে-গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম, কুবির বাই, তাই করুম-আইনা দিমু কপিলারে। তার পর যেন এক দিন-

কপিলা আসিয়া বলে, 'থাকবা না কি মাঝি?'

কুবের বলে, 'না!'

'দুই দিন থাইকা যাও? আইছ ক্যান কও দেহি?'

'সুবচনীর হাটে যামু মন কইরা বাইরইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।'

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, 'সুবচনীর হাট নাকি আইজ?'

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, 'না?'

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িতে যাইও, বলিয়া কপিলা রান্না ঘরে যায়। কুবের উঠিয়া নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহার মাচার উপরকার উপুড় করা কালো হাঁড়িটার ছায়া পড়ে যেন। কপিলার সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে? পদ্মানদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আর এক হাটে বেচিয়া দিয়াছে-অনেক দিন আগে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবেরকে দেখিয়া শ্যামাদাস খুশি হইল। দু জনে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া এক সঙ্গে খাইতে বসিল। অতিথি আসিয়াছে বলিয়া কপিলা আজ অনেক রান্না করিয়াছে। কিন্তু খাদ্যে কুবেরের রুচি ছিল না। কুবেরের হঠাৎ আসিবার কারণটা শ্যামাদাসও জানিতে চাহিল। কুবের এবার এক আশ্চর্য মিথ্যা রচনা করিয়া বসিল। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসের। অনেক সুবিধা সেখানে বাস করার। বাড়ি-ঘর-বস্ত্র জমি-জমা সব এখন বিনা মূল্যে পাওয়া যাইবে, দশ-বিশ বছর পরে দ্বীপে বসতির বিস্তার হইলে নাম মাত্র খাজনা ধার্য হইবে জমির, পুরুষানুক্রমে স্বত্ব জন্মিবে জমিতে। শ্যামাদাস যদি দশ জনকে এই সুবর্ণ সুযোগের সংবাদ জানায় আর কেহ ময়নাদ্বীপে যাইতে রাজি হইলে কুবেরকে যদি খবর দেয়, বড় ভালো হয় তবে।

শ্যামাদাস অবাক হইয়া বলিল, 'চা-বাগানের ঠিকাদারি নিছ নাকি মাঝি, আঁই?'

'চা-বাগান? কিসের চা-বাগান? শ্যামাদাস চলুক না ময়নাদ্বীপ দেখিয়া আসিবে। আইজ চলুক।'

'তুমি যাও না ক্যান ময়নাদ্বীপি?' শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করিল। কুবের থতমত খাইয়া বলিল, 'আমিও যামু।'

আজ এখানে থাকিয়া যাওয়ার জন্য কুবেরকে অনেক অনুরোধ করিল শ্যামাদাস। কিন্তু থাকিবার উপায় কি আছে কুবেরের! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাকে ময়নাদ্বীপের বারতা প্রচার করিতে হইবে।

সুবচনীর হাটের ভিতর দিয়া আমিনবাড়ির পথ। হাটের শূন্য চালাগুলি খাঁ খাঁ করিতেছিল, পথের ধারে স্থায়ী দোকান ও আড়তগুলি শুধু খোলা আছে। একটা খাবারের দোকানের সামনে নড়বড়ে বেঞ্চিটাতে কুবের বসিয়া পড়িল। ভয়ানক শীত করিতেছিল কুবেরের, শরীরটা ছমছম করিতেছিল আর চোখ দুটো করিতেছিল জ্বালা। হুড়মুড় করিয়া জ্বর যে আসিতে অনেকক্ষণ আগেই সে তাহা টের পাইয়াছিল। বেঞ্চিটা রোদে সরাইয়া চাদর

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, দোকানের ছায়া কুবেরকে অতিক্রম করিয়া হাটের চালাগুলির মাথায় উঠিয়া গেল, কুবের তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল বেঞ্চিটাতে। শেষে ময়রা তাহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

জ্বর আসিবার মুখে ভোজ খাইয়াছিল, অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে কুবেরের। কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের অবস্থা ভাল বলিয়া, সে জ্বর-গায়ে পথে নামিয়া আসিয়াছে, এত জ্বর যে আসিবে কুবের তা ভাবিতে পারে নাই। মাথার মধ্যে যেন কুয়াশা নামিয়াছে আর শব্দ হইতেছে গমগম। কোথায় কী অবস্থায় সে পড়িয়া আছে তাও মাঝে মাঝে গোলমাল হইয়া যাইতেছে সব,- সমুদ্র তরঙ্গ, দুর্গাপূজার আলো, অন্ধকার একটা চাঁচের বেড়ার বাহিরে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষ, বার বার জালা নামানো উঠানো, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা মাছের লাফালাফি সব একাকার হইয়া যাইতেছে। ময়রা মুখের চাদর সরাইয়া দিলে কুবের আরক্ত-চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, বিড়বিড় করিয়া বলে, শ্যামাদাসেরে খবর দিবা, আকুরটাকুরের শ্যামাদাস?

সন্ধ্যার পর কুবের আবার ফিরিয়া গেল কপিলার কাছে, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া একটা মোটা কাঁথা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়া কপিলা রাঁধিতে গেল। অন্ধকার ঘরে কুবের শুইয়া রহিল একা।

শেষ রাত্রে ঘাম দিয়া কুবেরের জ্বর ছাড়িয়া গেল সেই সঙ্গে ঘুমও ভাঙিয়া গেল তাহার, আর ঘুম আসিল না। একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধে সে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অল্প অল্প আলো হইলে সে উঠিয়া আসিল। ঘরখানা খুবই ছোট, ঘরের অর্ধেক জুড়িয়া পাটের স্তূপ আর দরজার কাছে প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা বাঁধা, শুইয়া শুইয়া দাড়ি নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে।

শরীরটা বড় দুর্বল বোধ হইতেছিল কুবেরের। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে গেল। কপিলা উঠানে গোবর লেপিতেছিল, বলিল, 'কি বা আছ মাঝি?'

কুবের ক্ষীণস্বরে বলিল, 'জ্বর নাই। আমি অখন যামু কপিলা।'

এখনি যাইবে কুবের, এই ভোরে? নাই বা গেল সে আজ দুর্বল শরীর লইয়া? একটু সুস্থ হইয়া কাল গেলে হয় না? অন্তত কিছু খাইয়া যাক সে। এখনি দুধ দুহিয়া কপিলা জাল দিবে, একটু দুধ খাইয়া যাক।

না, কুবের কিছু খাইবে না। প্রয়োজন নাই। পাঁঠা ও পাটের সৌরভে তাহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। বিষণ্ন বদনে কুবের মাথা নাড়ে। পদ্মানদীর কূল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তাহার। গঙ্গার বাতাস গায়ে না লাগিলে, কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে, সে সুস্থ হইবে না।

কপিলা গোবর লেপা স্থগিত করিয়া বলে, 'গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না। ঘরভরা মাইনষের পাল, ঘর নি আছে আর তোমারে দিমু শোওনের লাইগা?'

কুবের বলিল, 'হ রে কপিলা হ। ব্যাজাল পারিস না, তর ব্যাজালে গাও জ্বলে।'

'গাও জ্বলে মাঝি? গাও জ্বলে?'

'হ, জ্বলে! গরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে।'

কপিলা ফিসফিস করিয়া বলে, 'চুপ কর মাঝি' বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউককা কথা কহিয়া দিই মাঝি, মাথা খাও দিদিরে কথাটা কইও! কইও, কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথি কই থাকব, অতিথি কী খাইব, কপিলারে কেডা জিগায়? দুষী কইরো মাঝি, শাইপো-কিন্তু এই কথাডা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।'

'কার লগে কথা কস বৌ?' ঘরের ভিতর হইতে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কপিলা চাপা সুরে বলে, 'যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।'

আমিনবাড়ির হাসপাতল হইতে গোপীকে সঙ্গে করিয়া জলপথে কুবের গ্রামে ফিরিল। তাহার শীর্ণ চেহারা দেখিয়া মালা বার বার জিজ্ঞাসা করিল কী হইয়াছিল তাহার, ফিরিতে এত দেরি হইল কেন? প্রশ্নগুলিকে এড়াইয়া গেল কুবের। অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে, নদীতীরের একটানা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে!

গ্রামে ফিরিয়া কুবের দেখিল, রাসু ইতিমধ্যে পীতমের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। যুগীর ছেলে হইয়াছে, পীতমকে কে আর দেখিবে, কাজটা তাই পাইয়াছে রাসু। যুগীর মতো রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে, রাসু নীরবে সেবা করে বুড়ার, রাগও করে না দুঃখিতও হয় না। রাসুর ধৈর্য দেখিয়া কুবের খুশি হয়, পীতম খুশি থাকিলে রাসু হয়তো কিছু পাইবে টাকা-কড়ি, গোপীরই ভালো হইবে তাহাতে। এমন কি, পীতমকে দেখিতে গিয়া তাহার কাছে রাসুর কিছু প্রশংসাও করিয়া আসে কুবের। বলে, মনটা ভালো রাসুর, দয়া-মায়া আছে রাসুর বুকে, নকুল-টকুলের মতো পাজী সে নয়। পীতম শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, 'অরে তুই চিনিস না কুবির, অ ডাকাইত। একদিন আমার বুকে চাকু মাইরা সর্বস্ব নিয়া পলাইব হারামজাদা, তুই আচস কোন তালে?'

কুবের প্রতিবাদ করে। না রাসু সে রকম নয়। বড় ভালো রাসু।

কয়েক দিন পর হোসেন মিয়া ফিরিয়া আসিলে কুবেরের অলস দিনগুলি শেষ হয়। রকমারি ব্যবসা হোসেনের, ধান, পাট, বিড়ির পাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মসলাপাতি এক-একবার এক-এক রকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে।

গোয়ালন্দের অপর তীরে এক বার সাত শ ছাগল আসিয়া হাজির। সারা দিন ধরিয়া কুবের তাহাদের নদী পার করিল। ছাগলের গন্ধে কষ্টকর রাত্রি যাপনের কথা। বাড়িতে পরের শাসনে নিরুপায় নির্বাক বৌ কপিলা যেখানে তাহাকে পাট-জমানো পাঁঠা-বাঁধা ভাঙা ঘরখানায় শুইতে দিয়াছিল।

তারপর একদিন চাঁদপুর যাওয়ার হুকুম পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, দিবারাত্রি নৌকা বাহিয়া যাওয়া চাই। গণেশ বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল। শম্ভু ও বগা বহুদিন হোসেনের অধীনে কাজ করিয়াছে, তাহারা কিছুই বলিল না, প্রাণপণে বৈঠা বাহিয়া কুবেরকে অবাক করিয়া দিল। হোসেনকে কুবের এখন কিছু কিছু চিনিতে পারিয়াছে। সাধারণত সময়ের হিসাব হোসেনের একটু শিথিল, নৌকার ক্ষেপ দিতে মাঝিরা দেরি করিলে কিছু বলে না সে, শম্ভু ও বগা তাই গা ছাড়িয়া দিয়া বৈঠা ধরে কুবেরকে তাহারা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু হোসেন যখন মুখ ফুটিয়া বলে যে দ্রুতগতি প্রয়োজন, শম্ভু ও বগার শৈথিল্য অন্তর্হিত হয়। এমনভাবে বৈঠা বাহিতে থাকে তাহারা যেন ভূতে পাইয়াছে তাহাদের। মনে মনে সায় দেয় কুবের। এমনিভাবেই কাজ নিতে হয় বটে মানুষের কাছে, এমনি কৌশল! একটু দেরিতে যখন কিছুই আসিয়া যায় না, মাঝিদের সঙ্গে তখন বকাবকি না করিলে তাড়াতাড়ির সময় দু'বার বলিতে হয় না, এতটুকু ইঙ্গিত পাইলে অলস্য পরিতৃপ্ত মাঝিরা সহসা অতিমাত্রায় কর্মঠ হইয়া ওঠে।

হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় কুবের প্রতিনিয়তই পায়। বিস্তৃত তাহার কর্মক্ষেত্র, এখানে-ওখানে ছড়ানো তাহার জীবন, এলোমেলো তাহার চলাফেরা, তবু চারি দিকে সামঞ্জস্য, সব নিয়মে বাঁধা। একটা জটিল বিশৃঙ্খলায় সেসব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

চাঁদপুরে হোসেন মিয়া নৌকায় যোগ দিল। ময়নাদ্বীপের পথেই এবারও নৌকা চলিল, নোয়াখালির উপকূলে ক্ষুদ্র-একটি

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

গ্রামের কাছে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় বোঝাই দেওয়া হইল নারিকেল। বোঝাই শেষ হইল কিন্তু নৌকা খুলিবার হুকুম হোসেন দিল না। দুই দিন সেখানে নিষ্কর্মা হইয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নদীর মোহনার দিক হইতে মুসুরি-বোঝাই প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী বোট আসিয়া ভিড়িল পাশে, চট্টগ্রামবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া অনেক ক্ষণ হোসেনের সঙ্গে করিল পরামর্শ। বোট হইতে তারপর ত্রিপল-মোড়া কী যেন লুকাইয়া ফেলিল। তারপর হোসেন ও বৃদ্ধ মুসলমান নামিয়া গেল তীরে, গুণিয়া গুণিয়া হোসেন কতকগুলি নোট তাহার হাতে দিল, নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'নাও খোলো কুবির বাই।'

বড় কৌতূহল হইতেছিল কুবেরের। পাটাতনের নিচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে হোসেন। হোসেনকে প্রশ্ন করিবার সাহস কুবেরের হইল না। অনেক রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া রাঁধিবার আয়োজন করিবার সময় শম্ভুকে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু বলিল, 'আপিম মিয়া, আপিম। চুপ যাও।'

আপিম? চুপি চুপি আপিমের ব্যবসা করে হোসেন? এ তো ভালো কথা নয়!' নানা দিকে কত উপার্জন হোসেনের, এই সব অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন তাঁর? তাহা ছাড়া চোরাই আপিমের ব্যবসা তো সহজ বিপদের কথা নয়। ধরা পড়িলে কী উপায় হইবে তখন? কুবেরের ভয় করিতে লাগিল। হোসেন মিয়ার সঙ্গে যে দিন সে ভিড়িয়াছে সেই দিন হইতেই সে জানে এক দিন অনিবার্য বিপদ আসিবে, একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ কুবের বিপদের স্বরূপটা বুঝিতে পারিল। আজ হোক, কাল হোক, হাতে পড়িবে হাতকড়া, তার পর দু-দশ বছর জেলের বাহিরে কুবেরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ছইয়ের ভিতরটা হোসেন মিয়া দখল করিয়াছে, নৌকার উন্মুক্ত অংশে হোগলার ঢাকনি চাপাইয়া মাঝিরা শয়ন করে। শুইয়া শুইয়া কুবের অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করিল। একবার ভাবিল, এবার গাঁয়ে ফিরিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় আর সে কাজ করিবে

না। জেলে যাওয়ার চেয়ে না খাইয়া মরাও ভালো। কিন্তু না খাইয়া মরার সঙ্গে কুবেরের পরিচয় আছে। হোসেন মিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া জীবনে সে সচ্ছলতার সুখ জানিয়াছে। এই কাজ ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা তাহার হইবে খানিক ক্ষণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কুবের বুঝিতে পারে জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। ক্ষোভে কুবেরের চোখে জল আসে। এ কী অন্যায় হোসেন মিয়ার! এই সব বিপজ্জনক কাজগুলি বাদ দিলে তাহার তো কাজের অভাব নাই, সেসব কাজে ব্যাপৃত না রাখিয়া কুবেরকে কেন সে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে? তারপর কুবের ভাবে, এই সব লাভের অংশও তো তাহার পাওয়া উচিত। জেলে যাওয়ার ঝুঁকি যার সে কি শুধু বৈঠা বাহিবার মজুরিই পাইবে?

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। কল্পনায় সে বার বার এই ঘটনাগুলি ঘটাইয়া যায়।: হোসেনের অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভারি অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের কালো বেল্ট হইতে এক তাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়! চার ভিটায় চারখানি বড় বড় ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানের মারাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর এক দিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের– 'ও কপিলা, আমারে ফেইলা যাইস না, যাইস না-আমি মইরা গেলাম কপিলা তোরে না দেইখা!'

কেতুপুরে ফিরিয়া কুবের এক আশ্চর্য সংবাদ শুনিল!

পীতমের বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরে সিঁদ কাটিয়াছে চোর। ঘরের কোণের কোথায় পীতম মস্ত একটি ঘটি ভরিয়া টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, চোরের তাহা জানিবার কথা নয়। তবু সেখানটা খুঁড়িয়াই ঘটিটা চোর নিয়া গিয়াছে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

টাকার শোকে বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে পীতম। চুরির ব্যাপারে রাসুকেই সে সন্দেহ করে। রাসু নিজে সিঁদ দিয়াছে এ কথা সে স্পষ্ট বলে না, তবে চোরের সঙ্গে রাসুর যে যোগ আছে তাহাতে পীতমের সন্দেহ নাই। ঘরের লোক বলিয়া না দিলে ঘটির সন্ধান চোর পাইত কোথায়?

পীতমের গালাগালিতে রাসু কখনো রাগ করে নাই। কিন্তু এ বার চুরির অপবাদ দেওয়া মাত্র পীতমকে আচ্ছা করিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এটাও বড় সন্দেহজনক।

চুরির অপবাদের জন্য যেন নয়। টাকার সঙ্গেই যেন সে গিয়াছে? এতদিন গেল না কেন তবে, পীতমের যত দিন টাকা ছিল?

কুবের খবর নিতে গেলে পীতম কাঁদিয়া চোর, রাসু ও বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে তাহার নালিশ জানাইতে লাগিল। হায়, তাহার সারা জীবনের সঞ্চয়, সাত-কুড়ি তের টাকা। কোথায় আছে তাহার সেই পলাতক পুত্র, বুড়ো বাবাকে মনে করিয়া কবে ফিরিয়া আসিবে সেই আশায় পীতম যে টাকাগুলি জমাইয়া রাখিয়াছিল। সে কি চোরকে দিবার জন্য? লক্ষ্মীছাড়া রাসুর পেটে যাওয়ার জন্য?

কুবের বলে, 'রাসু জানল কি বা কই থুইছিলা ঘটি?

তাহা কি পীতম জানে? যে শয়তান রাসু কেমন করিয়া যেন টের পাইয়া গিয়াছে ঘটিটা কোথায় পোঁতা ছিল, রাসুর অসম্ভব কাজ নাই। ঘটির সন্ধান করিতেই হয়তো সে আসিয়াছিল পীতমকে সেবা করিবার ছলে! সারাদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিত রাসু। এ কোণ ও কোণ করিয়া বেড়াইত, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া কী যেন খুঁজিত। তখনি সন্দেহ হইয়াছিল পীতমের। হায় যদি সে সাবধান হইত!

কুবের বিশ্বাস করিল না রাসুর অপরাধ। ঘটি কোথায় পোঁতা তাহাই যদি রাসু জানিবে, চোরের সঙ্গে যোগ দিয়া টাকার সে ভাগিদার জুটাইবে কেন? নিজেই তা অনায়াসে চুপিচুপি ঘটিটা সরাইয়া ফেলিতে পারিত, তারপর গর্ত বুজাইয়া লেপিয়া মুছিয়া

ঠিক করিয়া রাখিলে কতকাল পরে পীতম টাকা চুরির কথা টের পাইত ঠিক ছিল না। সিঁদ কাটিবার হাঙ্গামা রাসু করিতে যাইবে কেন?

চৌকিদার থানায় খবর দিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া চুরির তদন্ত করিল। পুলিশ দেখিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, হোসেন মিয়ার সঙ্গে এবার নৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া পুলিশের জন্য চিরন্তন স্বাভাবিক ভীতিটা কুবেরের অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের কাছে পীতম অম্লান বদনে বলিয়া দিল রাসুকে সে সন্দেহ করে।

রাসুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, তাহার ঘরখানা খুঁজিয়া দেখা হইল, তার পর রাসুর হাতে হাতকড়া না দিয়াই পুলিশ চলিয়া গেল। না, রাসুর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই।

পুলিশ চলিয়া গেলে পীতমের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া অনেক ক্ষণ রাসু যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া পীতমকে অভিসম্পাত করিল। শুনিয়া কে বলিবে পীতম তাহার মামা।

তার পর এক দিন সকালে কুবেরের কাছে আসিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে বিয়া দিবা?'

কুবের তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, 'গতিক কি রে রাসু? পীতম খুড়ার টাকা তুই নিছস?'

রাসুর মুখখানা একটু বিবর্ণ হইয়া গেল বৈ কি?

সে বলিল, 'কী কও লখার বাপ, আঁই? টাকা নাই আমার? কাম করি না আমি?'

'কী কাম করস?'

'শেতল বাবু কাম দিছেন বাবুগো নায়। মামার ঘরে চুরি করুম? অমন কথা কইও না লখার বাপ।

তখন কুবের বলিল, 'পণের টাকা দিয়া থো না ক্যান তবে?

রাসু বলিল, 'দিমু। কবে বিয়া দিবা কও?'

গোপী সারিয়া উঠিতেছিল। এখনো সে ভালো করিয়া হাটিতে পারে না বটে, তবে ক্রমেই পায়ে জোর পাইতেছে। মাসখানেক

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পরে বিবাহ তাহার দেওয়া যায়। কিন্তু বিবাহের আগে টাকাটা কুবেরের পাওয়া চাই, মেয়ের গায়ে ওঠা চাই গহনা। রাসুর মুখের কথায় নির্ভর করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়।

যথা সময়ে টাকা ও গহনা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রাসু বিদায় হইল। প্রতিজ্ঞা করিল সে অবলীলাক্রমে, রাসুর যেন টাকার ভাবনা শেষ হইয়াছে বাবুদের নৌকায় কাজ পাইয়া, সে যেন বড়লোকই হইয়া গিয়াছে। টাকা ও গহনার কথা শুনিয়া একদিন মুখে তাহার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, আজ সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত!

মালা বলে, 'রাসুরে য্যান কেমন কেমন দেহি, আমি ডরাই মাঝি।'

কুবের বলে, 'ডরাইয়া কাম নাই তর।'

'আঁই?' বলিয়া মালা অবাক হইয়া থাকে।

কুবের গোপীকে ডাকে। লাঠি ধরিয়া হাঁটিতে বলে গোপীকে। গোপী কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়, কষ্টে দু-এক পা হাঁটে। কুবের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলে, 'সারব গোপীর মা, খাসা সারব পাওখান গোপীর। রাসুর লগে ক্যান দিমু বিয়া?'

কইলা যে রাসুরে।

কুবের এক গাল হাসে। বলে, 'তুই নি মাইয়ালোক গোপীর মা, বোঝস না। রাসুরে হাতে থুইছি, পাও যদি না সারে মাইয়ার, রাসুর লগেই দিমু। আর সাইরা যদি যায় গোপীর মা, পাওখানা যদি সাইরা যায় গোপীর-'

মহোৎসাহে কুবের গোপীর হাঁটুতে হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ মালিশ করিতে থাকে। জোরে জোরে ঘষে কুবের, ব্যথায় গোপী কাতরায়। কুবের ধমক দিয়া বলে, 'চুপ থাক চুপ থাক। জোরে জোরে না দিমু ত সারব ক্যান?' মালিশ করিতে করিতে থামিয়া গিয়া হাঁটুটা সে টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। বলে, 'ফুলা কমে নাই গোপীর মা?'

'হ। কম যেন লাগে।'

বলিয়া মালা উৎসুক চোখে গোপীর পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। অনেক ক্ষণ পরে সলজ্জভাবে বলে, 'মনে এউককা সাধ ছিল মাঝি। কমু?

হ, এমনিভাবে ভনিতা করে মালা। মালার তামাটে মুখখানা একটু রাঙা দেখায়। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করে কুবেরকে হাসপাতালের যে ডাক্তার গোপীর পা ভালো করিয়া দিয়াছে সে কি মালার পা খানার কিছু করিতে পারে না? একবার গিয়া দেখাইয়া আসিলে হয় কিন্তু। কিছু যদি ডাক্তার না করিতে পারে নাই করিবে, মালার বড় সাধ একবার গিয়া দেখাইয়া আসে। কুবের কী বলে?

কুবরে গম্ভীর হইয়া বলে, 'তর পায়ের কিছু হইব না গোপীর মা।'

কেন? হইব না কেন? মালা জিজ্ঞাসা করে আহা, একবার দেখাইয়া আসিতে দোষ কী? ডাক্তার যদি বলে কিছু হইবে না, নিজের কানে শুনিয়া আসিয়া মালা নিশ্চিত হইয়া থাকিবে। এক বার লইয়া চলুক কুবের তাহাকে। এককোঁটা যদি মায়া থাকে তাহার জন্য কুবেরের বুকে, একবার সে তাহাকে লইয়া চলুক সদরের হাসপাতালে। কুবের কি বুঝিবে খোঁড়া পায়ের জন্য সারা জীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে।

না? লইয়া যাইবে না কুবের? আঁই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ! মালার চোখে জল আসে। বিনাইয়া সে বলিতে থাকে, যে মেয়ের জন্য কুবের দশবার হাসপাতাল যাইতে আসিতে পারে, মালাকে একবার শুধু একটি বার লইতে তাহার আপত্তি! হ, অনেক পাপ করিয়াছিল আর জন্মে মালা, এবার তাই এমন কপাল লইয়া জন্মিয়াছে। কোলে ছেলেটাকে মালা মাই ছাড়াইয়া নিচে ফেরিয়া দেয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিয়া দরজার খুঁটিতে-ঠকঠক করিয়া মাথা ঠোকে আর কাঁদিতে কাঁদিতে আহ্বান করে মরণকে-যে মরণ এমন নির্দয় যে মালার মতো পোড়া-কপালীর দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'চুপ যা গোপীর মা, চুপ যা!'

কেন চুপ যাইবে? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্য? সে তো কপিলার মতো ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না যে তাহাকে লইয়া কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাইবে।

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, 'কি বা কথা কস্ গোপীর মা? মাইরা ফেলুম কইলাম।' তারপর সে সুর বদলাইয়া বলে, 'হাসপাতালে যাওনের লইগা কাঁদনের কাম কী, আঁই? যাইবার চাস নিয়া যামুনে! যা মুখে লয় কইয়া রাগাইস না গোপীর মা!

মালা ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে বলে, 'নিবা, নিয্যস? নিবা?'

'নিমু।'

কিন্তু মালাকে আমিনবাড়ি নিয়া যাওয়ার সময় কুবেরের হয় না। হোসেন মিয়ার কাজের এখন অন্ত নাই, অবিরত চালান আসিতেছে, চালান যাইতেছে, এ বছর সতেজে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে হোসেন, মাঝখানে আবার একবার নৌকা লইয়া নারিকেলের ও চোরাই আপিমের চালান আনিতে কুবেরকে সেই নোয়াখালির উপকূলে যাইতে হইল। এবার আপিম পৌঁছাইয়া দিল একটি স্টিমলঞ্চে, লঞ্চে এক সাহেব আসিয়াছিল, হোসেন মিয়াকে কী তার খাতির! আপিমের পুঁটুলি নিয়া নৌকা চালাইতে এবারও কুবেরের বুকের মধ্যে সমস্ত পথ একটা আতঙ্ক জাগিয়া রহিল। গতবার ফিরিয়া গিয়া হোসেন প্রত্যেক মাঝিকে দশটা করিয়া টাকা বখশিশ দিয়াছিল-এবারও দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু টাকার কথা ভাবিয়া কুবেরের এক বিন্দু আনন্দ হইল না।

গণেশ জিজ্ঞাসা করে, 'কী ভাব কুবিরদা? ঝিমাও ক্যান? মিয়া বাই আপিম দিছে নাকি?

কুবের বলে, 'চুপ যা বলদ!'

গণেশ বলে, 'কুকীর মা রূপার পৈছা চায় কুবিরদা। ভাবি কি, ই বার মিয়া বাই টাহা দিলি দিমু পৈছা গড়াইয়া কুকীর মারে।'-

গণেশের খুশি ধরে না, কুবেরের গায়ে ঠেলা দিয়া বলে, হোসেন মিয়ার নায় কাম নিয়া বড় কাম করছ কুবিরদা। টাহার মুখ দেখলাম।

কুবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদূর নদীবক্ষে চাহিয়া বলে, 'উটা কিরে গণশা? পুলিশের লন্‌চো নাকি?

'হ'। কুবের শিহরিয়া বলে, 'কোন দিকে যায়?'

'আমাগো দিকে আহে দেহি কুবিরদা!'

কুবের বিবর্ণ মুখে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। ফিস ফিস করিয়া বলে, 'পুলিশ লন্‌চো আহে মিয়া ছাব।'

হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে, বৈঠা ধর গিয়া কুবের বাই। হোসেন মিয়া থাকতি কারে ডরাও? নদীর মধ্যে জাল ফেলাইয়া মাল উঠাইব কোন হালার পুত?'

হ? বিপদ ঘনাইয়া আসিলে আপিমের বাণ্ডিল নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া গেল? তাই হইবে বোধ হয়? সেই জন্যই হয়তো হোসেন সর্বদা জলপথে আপিমের চালান নিয়া আসে, নতুবা নোয়াখালি হোক চট্টগ্রাম হোক রেলে স্টিমারে চাঁদপুর আসা ঢের সুবিধা। কুবেরের ভয় কিছুটা কমে। তবু সুদূর পুলিশ-লঞ্চের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না। লঞ্চটি যখন ক্রমে ক্রমে আসিয়া পাশ দিয়া চলিয়া যায় কুবের শ্বাসরোধ করিয়া থাকে।

একদিন ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবের মালাকে দেখিতে পাইল না। গোপী বলিল, 'রাসুর সঙ্গে মালা আমিনবাড়ি হাসপাতালে গিয়াছে।'

কুবের রাগিয়া বলিল, 'কার নায়?'

'বাবুগো নায়।'

তিনদিন নদীর বুকে কাটাইয়া আসিয়াছে, মেজাজ গরম হইয়া ছিল কুবেরের। রাগে সে গুম খাইয়া রহিল। গোপী গড়গড় করিয়া ব্যাপারটা বিস্তারিত বলিয়া গেল। মালা ক দিন থেকে রাসুকে তোষামোদ করিতেছিল, কাল মেজ বাবু মোকদ্দমার জন্য

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আমিনবাড়ি গিয়াছেন, সেই সুযোগে বাবুকে বলিয়া-কহিয়া মালা ও রাসু সঙ্গে গিয়াছে।

মেজ বাবু? মেজ বাবুর নৌকায় মালা আমিনবাড়ি গিয়াছে। তাহার দিকে কুবের কটমট করিয়া তাকায়। গোপীই যেন অপরাধিনী।

গোপী ভয়ে ভয়ে বলে, 'লখা লগে গেছে বাবা।'

সারাদিন কুবের বাড়ি ছাড়িয়া নড়িল না। জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। সমস্ত সকাল বেলাটা সে রাগে আগুন হইয়া রহিল, নিধু মাঝি আলাপ করিতে আসিলে তাহাকে অকথ্য গালাগালি করিয়া ভাগাইয়া দিল, বিনা দোষে মারিয়া চণ্ডীকে করিয়া দিল আধমরা। তারপর রাগ কমিয়া অপরাহ্ণে আসিল বিষাদ।

সন্ধ্যা হইল মালা ফিরিল না। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আসিল হোসেন। কুবের ছাড়া বড় ঘরখানা হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া ঘরের মাঝখানের খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া নিজে সে চালের খড় ফাঁক করিয়া ছোট ছোট দুটি বান্ডিল লুকাইয়া ফেলিল। খুঁটি বাহিতেও জানে হোসেন, গুণের লোকটার অন্ত নাই!

কুবের নীরবে এই অদ্ভুত কাণ্ড চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নামিয়া আসিয়া হোসেন বলিল, 'ডরাইও না কুবির বাই, ডর নাই।'

কুবের মুহ্যমানের মতো মাথা নাড়িল।

হোসেন বসিল। বলিল যে পুঁটুলি দুটি যত দিন সে না লইয়া যায়, কুবেরের ছুটি! সারা দিন বাড়ি আসিয়া আরাম করিবে কুবের, কেমন?

চালে গোঁজা জিনিস দুটিকে সে পাহারা দিবে বটে, কিন্তু বার বার ও দিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই কুবেরের। একেবারেই না তাকানোই ভালো। না, ঘরের চালায় কিছুই গোঁজা নাই কুবেরের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আজ হোসেন তাহার বাড়ি আসে নাই, খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া ঘরের চালে কিছুই সে গুঁজিয়া রাখে নাই।

'কী কও কুবির বাই, তাই না?' হোসেন মৃদু মৃদু হাসে।

'হ,' বলিয়া কুবের সায় দেয়।

সকলের চেয়ে বিশ্বাসী, সকলের চেয়ে নিরাপদ এই সরল পদ্মানদীর মাঝিটাকে হোসেন মিয়া যেন ভালোবাসে। কত টাকা হোসেন মিয়ার দূরে দূরে ছড়ানো, কত বড় তাহার ব্যবসা, এগার মাইল লম্বা একটা দ্বীপের সে, কুবের তো তাহার চাকর, তবু কুবেরের ছেঁড়া চাটাইয়ে হোসেন আরাম করিয়া বসে, বন্ধুর মতো গল্প করে কুবেরের সঙ্গে। চেনাই যেন যায় না এখন হোসেনকে! হোসেনের নৌকায় কাজ নেওয়ার আগে কুবের তো তাহাকে শুধু সঙ্গতিপন্ন বলিয়া জানিত, অসংখ্য উৎস হইতে হোসেনের যে কত টাকা আসে এখন ভাবিতে গেলে কুবেরের মাথা ঘোরে! সে আর গণেশ শুধু জানিয়াছে, কেতুপুরের আর কেহ হোসেন মিয়ার রহস্য জানে না।

টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাহাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু। অবসর সময়টা সে পদ্মার দীন-দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়। টাকার ফাঁপানো ব্যাগ পকেটে নিয়া বর্ষার রাত্রে জীর্ণ চালার তলে চাটাইয়ে শুইয়া নির্বিবাদে ঘুমাইয়া পড়ে।

সে দিন রাত্রে মালা ফিরিল না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় হাতের ভরে দুলিতে দুলিতে সে গৃহে প্রবেশ করিল। নদীর ঘাট হইতে এতটা পথ এমনিভাবে আসিতে কাপড়খানা তাহার কাদামাখা হইয়া গিয়াছে। কুবের খাইতে বসিয়াছিল, একবার চাহিয়া আবার খাওয়ায় মন দিল। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাইয়া মালা দাওয়ায় আসিয়া বসিল। কুবের চোখ তুলিয়া তাকায় না। চড়া গলায় পিসীকে আর দুটি ভাত আনিতে বলে।

মালা বলে, 'আগো শুনছ?'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

না কুবের শুনিতে পায় না, সে বধির হইয়া গিয়াছে। মালা বলে, 'তুমি ত নিলা না, রাসুর লগে তাই হাসপাতালে গেছিলাম। গোসা নি করছ?'

জবাবের জন্য মালা খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে। তার পর সজল কণ্ঠে বলে, 'ডাক্তার কয়, পাও সারনের না আমার।'

আর কত কথা মালা বলে, কুবের সাড়া-শব্দ দেয় না। খাইয়া উঠিয়া নীরবে তামাক টানিতে থাকে। গোঁয়ার কি সহজ কুবের।

মালা শেষে রাগিয়া বলে, 'ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মদ্যি থাইকা আইলাম, এউককা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান।'

'যা, বেড়া গিয়া-হারামজাদী, বদ।'

'কী কইলা মাঝি, কী কইলা?'

তারপর কী কলহই দুজনে বাঁধিয়া গেল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার। সিধুর বোন ছুটিয়া আসিয়া কাপড়খানা খুলিয়া লইল, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিল মালার। দুঃখিনী সে, বড় ছেঁড়া তাহার কাপড়খানা।

স্ত্রী-পুরুষে ভিড় করিয়াছে অঙ্গনে, তাহাদের সামনে পঙ্গু অসহায়া স্ত্রীর এই দশা, মালার দুরবস্থায় আমোদ পাইয়া সকলে হাসিয়াছে, কে যেন হাততালি দিল। এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল কুবেরের। লাফাইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া গাল দিতে দিতে সকলকে সে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া আসিল। তার পর নিজের একখানা কাপড় আনিয়া দিল মালাকে।

ক্রমে ক্রমে শীত কমিয়া আসিল।

কেতুপুর গ্রাম ও জেলেপাড়ার মাঝামাঝি খালটা শুকাইয়া গিয়াছে। পদ্মার জলও কমিয়াছে অনেক। ক্রমে ক্রমে মাঠগুলি ফসল-শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, পায়ে চলা পথগুলি স্পষ্ট ও মসৃণ হইয়া আসিয়াছে অনেক দিন আগে। আমগাছে কচিপাতা দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাখির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেশে। ঝাক বাঁধিয়া বুনো হাঁসের দলকে উড়িতে দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলি দক্ষিণে জোরালো সমগতি বাতাসে বাদাম তুলিয়া তরতর করিয়া ভাসিয়া যায়, দূরে গেলে অতিথি হাঁসগুলির মতই রহস্যময় মনে হয় তাহাদের। মাছ দুধ সস্তা হইয়াছে, পদ্মার চর হইতে কলসিভরা দুধ আসিয়া বাজারে চার পয়সা সেরে বিকাইয়া যায়।

শীতে কুঁকড়ানো গ্রামগুলি গা মেলিয়াছে। সকাল-সন্ধ্যায় মালা কাপড় ভাঁজ করিয়া লখা ও চণ্ডী শরীর ঢাকিয়া গলায় বাঁধিয়া দেয় না, খালি গায়েই তাহারা শুকনো ডোবা পুকুরের কাদা ঘাঁটিয়া মাছ ধরিতে যায়, ফাটা চামড়া উঠিয়া গিয়া ত্বক মসৃণ হইয়া আসিতেছে সকলের, মালার রং যেন আরও ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, এক মুষ্ঠি যৌবন যেন অতিরিক্ত আসিয়াছে মালার দেহে। মালাকে চাহিয়া রাত্রে কুবেরের ঘুম ভাঙে: কোনো দিন গৃহে, কোনো দিন পদ্মার বুকে।

রাসুর সঙ্গে গোপীর বিবাহের বন্দোবস্ত কিন্তু হইয়া গিয়াছে বাতিল। এ কীর্তিও হোসেন মিয়ার। সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক করিয়া দিয়াছে গোপীর জন্য, নাম তাহার বঙ্কু, বয়স বেশি নয়, এ জগতে বঙ্কুর আপনার কেহ নাই বটে, কিন্তু হোসেন মিয়া আছে, হোসেন মিয়া যার মুরুব্বি, কিসের অভাব তাহার? বঙ্কু পাঁচ কুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপীকে গহনা দিবে তিন কুড়ি টাকার, আর একদিন জেলেপাড়ার সকলকে দিবে ভোজ।

এ কথা জানিতে কুবেরের বাকি নাই যে বিবাহের পর নব দম্পতিকে হোসেন ময়নাদ্বীপে লইয়া যাইবে, কিন্তু জানিয়া কী লাভ? হোসেন মিয়ার অবাধ্য কুবের কেমন করিয়া হইবে? তাহা

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ছাড়া পাঁচ কুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ করিবার সাধ্য কুবেরের নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরের ঘরে যায়, কাছে অথবা দূরে। গোপী না হয় যাইবে দূরে- অনেক দূরের ময়নাদ্বীপে। হয়তো কখনো একটু মন কেমন করিবে কুবেরের। কিন্তু তাহার প্রতিকার কী? মন তো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের।

খবর শুনিয়া রাসু গালাগালি করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। যুগীকে গিয়া রাসু বুঝি ধরিয়াছে, তারপর একদিন শীতল আসিয়া রাসুর সপক্ষে খানিক ক্ষণ ওকালতি করিয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। বলিয়াছে, টাকা যদি বেশি চায় কুবের, সে তা বলে না কেন? সোনাখালির পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাহাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুর মতো পাত্র থাকিতে দূরদেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন?

কেন? এ কেন'র জবাব দিবার ক্ষমতা নাই কুবেরের। ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপীকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মতো মাঝে মাঝে তাহারও মনটা কি ছটফট করে না? তবু তাহাকে এসব বলা মিছে।

একদিন গোয়ালন্দে অধরের সঙ্গে কুবেরের দেখা হইয়া গেল। অধর বলিল, কয়েক দিন আগে কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে, কিছুদিন থাকিবে। বাড়ি ফিরিয়া কুবের সে দিন মালাকে বড় দরদ দেখায়। বলে, মালা কত কাল বাপের বাড়ি যায় নাই, ইচ্ছা করে না যাইতে? ইচ্ছা যদি হয় তবে না হয় চলুক মালা কাল, দু-চারি দিন থাকিয়া আসিবে। মালা বলে, না, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই। বাপ কি যাইতে বলিয়াছে তাহাকে? এতকাল সে যায় নাই একবার কি দেখিতে আসিয়াছে তাহাকে? মালা কাঁদ-কাঁদ হইয়া যায়। বলে, তাহার মনটা শুধু পোড়ায় বাপ-ভাইয়ের কথা ভাবিয়া, তাহার জন্য ওদের কাহারো দরদ নাই। কেন সে যাইবে বাপের বাড়ি যাচিয়া? কুবের বিপন্ন হইয়া বলে, গেলে দোষই বা কী? বাপের বাড়ি তো বটে, যাচিয়া বাপের বাড়ি যাইতে কাহারো লজ্জা নাই। কালই চলুক মালা, দু দিন একদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে।

এবার মালা সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, 'যাওনের লাইগা জিদ কর ক্যান মাঝি।'

'জিদ কি বা? দরদ কইরা কইলাম, জিদ।'

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেরের। চরডাঙা যাওয়ার আর তো কোনো ছুতা তাহার নাই! জামাই অকারণে শ্বশুরবাড়ি গেলে দোষ অবশ্যই কিছুই হয় না, কিন্তু এখন কপিলা ওখানে আছে, হঠাৎ কুবেরের আবির্ভাব ঘটিলে কে জানে কী ভাবিয়া বসিবে। বসিয়া বসিয়া কুবের উপায় চিন্তা করে আর ক্রুদ্ধ চোখে মালার দিকে থাকিয়া থাকিয়া তাকায়। হ, আজ বসন্তের আদর্শ আবহাওয়া আসিয়াছে, কেতুপুরে দোলের উৎসব হইবে কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে।

বিকালে পদ্মার ঘাটে নৌকার তদবির করিতে গিয়া কুবেরের আরও মন কেমন করিতে থাকে। কাব্যের মসৃণ মার্জিত মন-কেমন-করা নয়, তাহার ভীরু প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি খাপ খায় ততখানি দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা। পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া শরীরটা কুবেরের ভালো হইয়াছে-খাদ্য যতটুকু শক্তি দিত আগে ব্যয় করিতে হইত তাহার দশগুণ, এখন সেটা শুধু বন্ধ হয় নাই, বিশ্রামও জুটিয়াছে অনেক। মনেরও যেন তাহাতে ব্যাকুল হওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়াছে এবং কমিয়া গিয়াছে দুর্বল অভিমান, সিদ্ধি বা আপিমের নেশার মতো আগে যাহা কুবেরের মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া রাখিত। নৌকায় বসিয়া কুবের যেন ভুলিয়া যায় যত নিষ্ঠুরতা করিয়াছে কপিলা, যত দুর্বোধ্য নির্মম খেলা সে করিয়াছে তাহার সঙ্গে। মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তাহার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বুঝে।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনি যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙায় কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে। কুবেরকে দেখিয়া তাহার বোতলটি কাত করিয়া আরও খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলা: তাহার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে। ঘাটে আরও নৌকা আছে, মাঝি আছে। এখানে থাকিতে ভালো লাগে না কুবেরের, বাড়ি ফিরিতেও ইচ্ছা হয় না। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করে, ভাঙিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত তীরের ফাটল-ধরা অংশগুলির উপর দিয়া। চলিতে চলিতে এক সময়ে দশ-বারো হাত ডাঙা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ধসিয়া পড়ে নিচে, শীতের পদ্মার জল যেখান হইতে হাত পনেরো পিছাইয়া গিয়াছে। মাটির একটা চাপড়াই বুঝি কোথায় ঘা দিয়া কুবেরকে অজ্ঞান করিয়া দেয়। মিনিট দশেক পরে চেতনা হয় কুবেরের। প্রথমে কুবেরের মনে হয় এই বুঝি কপিলারই এক কৌতুক। তার পর কষ্টে উঠিয়া বসিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে-শেষ বেলায় সূর্য যেন পদ্মাকেও নিঝুম করিয়া দিয়াছে, দূরের নৌকাগুলি এবং আরও দূরের স্টিমারটি যেন হইয়া গিয়াছে গতিহারা। বাতাসের জোর নাই, নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন ক্লান্ত। নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভালো বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে। মাথার বাঁ পাশটা দিয়া একটু রক্তও পড়িয়াছে? তাই বলিয়া কেবলি এখন মনে আসিতে থাকিবে কেন গণেশের সেই গান-পিরীত করিয়া জ্বইলা মলাম সই, আলো সই? কাহার সঙ্গে পিরীত করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে কুবের? কপিলার সঙ্গে? হ, ভারি মেয়ে মানুষ কপিলা! তাহার সঙ্গে আবার পিরীত। ছেলেমানুষ নাকি কুবের?

পদ্মায় স্নান করিয়া কুবের বাড়ি ফিরিল। ভাত খাইতে বসিয়া হঠাৎ কুবের বলিল, 'চরডাঙা যাবি লখা?'

'যামু বাবা, যামু!'

'কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই?'

হ, এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলের উৎসবে মামাবাড়ি যাইবে ছেলেরা। একা তো যাইতে পারিবে না তাহারা, কুবের তাই সঙ্গে যাইবে। কেহ টেরও পাইবে না কিসে কুবেরকে টানিয়াছে চরডাঙাতে।

মালা বলিল, 'অগো নিয়া যাইবা তো আমারেও নিয়া চল।'

কুবের বলে, 'না তরে নিমু না। যাবি না কইলি ক্যান?'

কুবের বাঁচিয়াছে। মালাকে লইয়া চরডাঙা যাওয়া কি সহজ কথা! রাজি না হইয়া ভালোই করিয়াছে মালা, যাতায়াতের ডুলিভাড়াটা কুবেরের বাঁচিয়া গেল।

মালা এখন যাইতে চায়। ছেলেদের লইয়া কুবের যদি সত্য সত্যই যায় চরডাঙা তবে সে যাইবে না কেন? কুবের তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলিয়াছিল বলিয়াই না প্রথমটা সে রাজি হয় নাই? মালা স্বামীর তোষামোদ আরম্ভ করে। রাত্রে খানিক রাগারাগি কাঁদাকাটি করিতেও ছাড়ে না। কিন্তু কুবের অটল। যাইবে না বলিল কেন মালা? কুবের যখন তোষামোদ আরম্ভ করিয়াছিল বাহাদুরি করিয়া তখন যাইতে অস্বীকার করিল কেন? মরিয়া গেলেও কুবের তো তাহাকে চরডাঙায় লইবে না। হ, কুবেরের গোঁ মালা জানে না। কী ভাবিয়াছে সে কুবেরকে।

রাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিয়া তুলিয়া কুবের রওনা হইয়া গেল। মালা কপাল কুটিয়া যাওয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল, কুবের ফিরিয়াও তাকাইল না। সকাল সকাল তাহারা পৌঁছিল চরডাঙায়। হাঁটিতে হাঁটিতে ছেলে দুটোর পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীকে মাঝে মাঝে কোলে করিয়া চলিতে হওয়ায় কুবেরের ধরিয়া গিয়াছে হাঁপ। শ্বশুরবাড়ির দাওয়ায় বসিয়া গামছা দিয়া সে ঘাম মুছিতে লাগিল। একটু পরে কপিলা একখানা পাখা আনিয়া দিল। কুবের খুশি হইয়া বলিল, 'আছস কি বা কপিলা?'

'কি বা দেখ?'

'কাহিল য্যান লাগে তরে।'

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

'হ, কাহিল হইছি।'

কুবের ব্যাগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান রে কপিলা, অসুখ নি করছে তর?

'মনডায় অসুখ মাঝি, তোমার-লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি?'

বলিতে বলিতে আঁচলের আড়াল হইতে হাত বাহির করিয়া এক ভাঁড় চুন-হলুদ কপিলা কুবেরের গায়ে ঢালিয়া দেয়। হাসিয়া গলিয়া পড়ে কপিলা। কুবের মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকে। আনন্দ অথবা দুঃখ কিসে তাহার রোমাঞ্চ হয় সে বুঝিতে পারে না। কেতুপুরে থাকিবার সময় এমনিভাবে হাসিত কপিলা। আকুরটাকুরে শ্যামাদাসের বাড়িতে এ হাসির আভাসও কপিলার মুখে সে দেখিতে পায় নাই।

কপিলার হাসির শব্দে বৈকুণ্ঠ বাহিরে আসে। লখা ও চণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া কপিলা চলিয়া যায় ভিতরে।

শ্যামাদাসের কাছে বৈকুণ্ঠ ময়নাদ্বীপের কথা শুনিয়াছে। সে সেই কথা আরম্ভ করিল। কথায় কুবেরের মন ছিল না, সে অন্য মনে বৈকুণ্ঠের কথার জবাব দিয়া গেল।

রঙ ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষা-ভূষা জেলে-মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড় অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রাকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতিকষ্টে বসিয়া আসে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্ন-ভিন্ন জামা, চারি দিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল, অধর ভিড়িয়া গেল দলে। তাথৈ তাথৈ নাচ, ছুটাছুটি হৈ চৈ, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি

ছুঁড়িয়া মারা-আনন্দ বটে দোলের! খানিক ইতস্ততঃ করিয়া লখা ও চণ্ডী অধরের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ছুটির গেল, কুবেরের বারণ কানেও তুলিল না।

দুপুরে খাইয়া উঠিয়া কুবের বলে, 'লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি। দিনে দিনে গাঁয় ফিরুম।'

মালা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আজ ফিরা আইলা যে?'

'মাইনষে থাকে তর বাপের বাড়ি?'

পথ হাঁটিয়া লখা ও চণ্ডী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। কুবেরও কম শ্রান্ত হয় নাই। জিরাইয়া জিরাইয়া গ্রামে পৌঁছিতে তাহাদের সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল। লখা ও চণ্ডী দুটি ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িল। কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে তাহাদের মুখে এ খবর শুনিয়া মালা গম্ভীর হইয়া গেল। কুবেরকে আর সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। খোঁড়া পা'টি টান কবিবার চেষ্টাতেই বোধ হয় এক বার তাহার মুখখানা হইয়া গেল বিকৃত। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নিজের পঙ্গুতা সম্বন্ধে মালা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কুঁকড়ানো শীর্ণ পা'টিকে সে মাঝে মাঝে সিধা করিবার চেষ্টা করে, দুই হাতে মাঝে মাঝে পা'টিকে ঘষিতে থাকে সজোরে। জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গ এতকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে।

বাড়ির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। গোপীর বিবাহের আগে ওখানে একখানা ঘর তুলিবার কথা ভাবিতেছিল কুবের। এতকাল সময় ছিল না, হোসেনের চালানি কারবারে এখন একটু মন্দা পড়িয়াছে। বাড়িতে থাকিবার সময় পায় কুবের। চরডাঙা হইতে ফিরিবার পরদিন সে ঘর তুলিবার জন্য বাবুদের অনুমতি আনিতে গেল।

কুবের কি জানিত অনুমতির জন্য মেজ বাবুর কাছেই তাহাকে দরবার করিতে হইবে! নিচু হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাতে মেজ বাবুর সামনে দাঁড়াইতে হইল কুবেরকে। করুণ কণ্ঠে জানাইতে হইল আবেদন। ঘর তুলিবে কুবের? মেজ বাবু হাসিয়া

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কথা বলেন। ফরাসের সামনে মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুবের পায়, কিন্তু যুক্তকর মুক্ত করিবার নিয়ম নাই। জেলেপাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করে মেজ বাবু! কে কেমন আছে? কাহার কেমন অবস্থা, কী রকম মাছ পড়িতেছে এ বছর? জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজ বাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজ বাবু পান না। মাঝিদের কাহারো সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়ও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজ বাবু থাকিয়া গিয়াছিল, কোনো মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড় লোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজ বাবু তো হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্ত হীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা-এসব যাহাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যাহারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যাহারা গরিব ছোটলোক, মেজ বাবু কেন তাহাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজ বাবুর চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করিয়াও যাহার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।

মালা, মালার কথাও মেজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। মালার পায়ের যে চিকিৎসা চলিতেছিল কী হইল তাহার? তারপর ফাঁকা জমিটুকুতে ঘর তুলিবার অনুমতি দিয়া কুবেরকে মেজ বাবু বিদায় দিলেন।

মালা আজও মুখ ভার করিয়াছিল। কিন্তু কৌতূহল দমন করা যায় না।

'কি কইল মাইজা কত্তা?'

'কী কইব? তোর কথা জিগাইল।'

'হ?'

'নায় তুইলা আবার তরে হাসপাতালে নিয়া যাইব কইল গোপীর মা।'

গোঁয়ার সহজ কুবের! গোঁ ধরিলে আর তো সে তাহা ছাড়িবে না? মেজ বাবুর নৌকায় মালা যে আমিনবাড়ি গিয়াছিল, কত কাল সে এ কথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে সেই জানে, হয়তো মালা যখন বুড়ি হইয়া যাইবে, বিকল পা'টির মতো সর্বাঙ্গ শীর্ণ হইয়া আসিবে তাহার, তখনও এ কথা ভুলিবে না কুবের। কলহ করিয়া মালা কাঁদে। মৃত্যু কামনা করে নিজের। কিন্তু এ বিষয়ে কুবের কঠোর নির্মম। অন্য বিষয়ে মালার সঙ্গে তাহার ব্যবহার বদলায় না, পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর জীবন তাহারই বক্ষের আশ্রয়ে আজ উথলিয়া উঠে, আমিনবাড়ি যাওয়ার জন্য অম্লানবদনে মালাকে সে পীড়ন করে। আজ রাত্রেই হয়তো কুবের মালাকে বুকে জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কী যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার। কাল হয়তো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজ বাবুর কথা তুলিয়া। এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মতো একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।

ঘর তোলা শেষ হইতে দিন দশেক সময় লাগিল। তারপর একদিন বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল গোপীর।

কপিলা আসিল বিবাহে।

সে না আসিলে বিবাহের কাজ করিবে কে? মালা তো পঙ্গু।

হলুদ মাখিতে মাখিতে হলদে হইয়া বিবাহ হইয়া গেল গোপীর। বরকনেকে কুবের পদ্মার নৌকায় তুলিয়া দিল। গোপী আবার ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়ার তাড়াতাড়ি নাই। বঙ্কু ও গোপী দুই মাস দেশে থাক, তাহাতে সে আপত্তি করিবে না।

বিবাহের পরই কপিলার ফিরিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কী ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কয় দিন পর শ্যামাদাস আসিয়া তাহাকে

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আকুরটাকুর লইয়া যাইবে। দিন দুই পরে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট বোঝাই করিল নৌকায়। তারপর দেবীগঞ্জে আসিল অনেক রাত্রে।

সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অত রাত্রে কেতুপুরে ফিরিতে রাজি হইল না। কুবেরের মন পড়িয়াছিল বাড়িতে। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল গ্রামের দিকে। নদীতে জেলে-নৌকার আলোগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইয়াছে, মাছ ধরিবার কামাই নাই পদ্মায়। চলিতে চলিতে কত কি ভাবে কুবের।

কেতুপুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া কুবেরের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল সাদা কাপড় পরিয়া এত রাত্রে একটি রমণী ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কোনো দিকে মানুষের সাড়া নাই। পদ্মার জল শুধু ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোর বাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।

ভীত কর্কশ কণ্ঠে বলিল, 'কেডা খাড়াইয়া আছ গো, কেডা?'

নদীর দিকে মুখ করিয়া রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, কুবেরের গলার আওয়াজে চমকাইয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেডা? মাঝি আইলা?'

কুবের অবাক হইয়া বলিল, 'কপিলা? দুপুর রাইতে ঘাটে। কী করস কপিলা।'

কপিলা কাছে আসিল, বলিল, 'ডরাইছিলাম মাঝি।'

কপিলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড় বিপদ হইয়াছে আজ। আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া বাড়ি তল্লাস করিয়াছে কুবেরের, ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে

কুবেরকে। সন্ধ্যার পর চুপি চুপি কপিলা তাই ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছে। কুবের ফিরিলেই সতর্ক করিয়া দিবে।

কুবেরের মুখে কথা সরিল না।

অনেক ক্ষণ পরে সে বলিল, 'রাসুর কাম। সব্বোনাশ করব কইছিল না রাসু-রাসুর কাম।'

কে জানে কী করিবে। বিপদে-আপদে মুখ চাহিবার একজন আছে কুবেরের, তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। ঘাটে হোসেনের নৌকা বাঁধা আছে দেখিয়া কুবের একটু আশ্বস্ত হইল।

কপিলার চোখ মুছাইয়া দিল কুবের, বলিল, 'বাড়িত যা কপিলা।'

'তুমি কী করবা?'

'হোসেন মিয়ারে বিত্তান্ত কই গিয়া, দেখি স্যায় কী কয়।'

'আমি লগে যামু মাঝি।'

হ, বাঁশের-কঞ্চির মতো অবাধ্য কপিলা। কোন মতেই কুবের তাহাকে বাড়ি পাঠাইতে পারিল না। কুবেরের সঙ্গে সে হোসেন মিয়ার বাড়ি গেল।

হোসেনকে কিছু বলিতে হইল না, খবর সে আগেই শুনিয়াছে। লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ময়নাদ্বীপ যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।'

আমি চুরি করি নাই মিয়া।

তাহা কি হোসেন মিয়া জানে না? কিন্তু চোরাই মাল যখন বাহির হইয়াছে কুবেরের ঘরে চোরকে সেখানে মাল রাখিয়া আসিতে কেহ যখন দেখে নাই কে বিশ্বাস করিবে কুবেরের কথা? বাহিরের কেহ শত্রুতা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে এমন কোনো বাহির হয় নাই, একেবারে ঘরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মাল পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া গরিব নয় কুবের?

বিবর্ণ মুখে কুবের মাথা হেঁট করিয়া থাকে।

ঘোমটার ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তাহার দিকে তাকায়।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একজন মুনিষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, 'যাবা ময়নাদ্বীপে?'

ঘাড় নাড়িয়া কুবের সায় দেয়।

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপী আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের। ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কী আছে?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাহিরের একটা ঘরে সাত জন মুসলমান মাঝি ঘুমাইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচ জনকে সঙ্গে করিয়া সকলে নদীঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপিচুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট। কুবের বলে, 'হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই, কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু। ফিরা আবার জেল খাটাইব।

কপিলা আর কথা বলে না।

ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাহাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

ছই-এর মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অত দূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

॥ সমাপ্ত ॥

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন ❑

১. গরিব বর্গাচাষি ওসমান। বহু কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরের জমিতে ফসল ফলায় সে। কিন্তু ফসলের পুরোপুরি অংশ তার প্রাপ্য নয়। ফসলের অর্ধেক সে পায়। এত কষ্টের ফসল সে সবটুকু পায় না বলে তার দুঃখের অন্ত নেই। সে খেতমজুর, খেতের মালিক নয়। খেতের মালিক খেতের কাছে না গিয়েও তাকে নানা কৌশলে ঠকিয়ে ফসলের সিংহভাগ কেড়ে নেন। এই মালিকেরা যেন জোঁকের মতো-ই রক্তচোষা। গরিব চাষির রক্ত চুষে এরা ফুলে ফেঁপে ওঠে। কিন্তু এ শোষণ দীর্ঘদিন চলতে পারে না। একদিন তারা সংঘবদ্ধ হয়। রুখে দাঁড়ায় শোষক জোতদারদের বিরুদ্ধে।

ক. 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?

খ. "ইলিশের মওসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়"-কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ওসমান মিয়ার মানসিকতার সঙ্গে কুবের মাঝির মানসিকতার কতটুকু মিল রয়েছে?

ঘ. ' প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ওসমান ও কুবের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে।' এই উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

২. মানিকগঞ্জের মধুপুর এলাকার অধিবাসী আমজাদ। এলাকার অধিকাংশ লোক মৃৎশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অভাব-অনটনের কারণে ছেলে- মেয়েকে ভালোভাবে খেতে দিতে পারে না সে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্কুলে পাঠাতে পারে না, তবে আধুনিকতার প্রভাবে মৃৎশিল্পে কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় আমজাদের পরিবারেও পরিবর্তন এসেছে। আজ তারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ক. মিছা কথা কইলাম নাকি রে কুবির? –এ উক্তিটি কার?

খ. "ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে- এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. আমজাদের পরিবারে স্বস্তির নিঃশ্বাসের কারণ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেদের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘ. সময়ের পটভূমিতে মৃৎশিল্পীদের পরিবর্তন আসলেও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে জীবনে পরিবর্তন দেখা যায় না। উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

৩. আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনের টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনের হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ক. কুবেরের মেয়ের নাম কী?

খ. হোসেন মিয়াকে রহস্যময় লোক বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্ধৃতাংশের পণপ্রথার সঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যঅসে পণপ্রথার যে বৈষম্য দেখা যায় তা নিরূপণ কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পণপ্রথার কারণ এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় 'পদ্মানদীর মাঝি'উপন্যঅসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪. পদ্মানদীর ভাঙনে মুন্সীগঞ্জের সুন্দরপুর গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বাস্তুহীন গরিব এই লোকগুলির পুনর্বাসনের জন্য কাজ করছে উদ্যমী, সাহসী ইকবাল রহমান। নিঃস্বার্থভাবে নিজের জমির অনেকখানি অংশ তাদের পুনর্বাসনের কাজে লাগালেন। অসহায় লোকগুলো ঠাঁই পেলো ইকবাল সাহেবের জায়গায়।

ক. রথের উৎসব কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়?

খ. মাছের দাম বুঝিয়ে দেওয়ার সময় ধনঞ্জয় কুবেরকে সরিয়ে দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ইকবাল সাহেবের সাহায্য করার মানসিকতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. "হোসেন মিয়ার মতো ইকবাল সাহেবের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসিকতা একেবারেই নেই।"-এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

free e-books & Software : www.tanbircox.blogspot.com